সপ্তকাণ্ড

সপ্তকাণ্ড

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

SAPTAKANDA
by Sanjib Chottopadhay
Published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073

প্রকাশক
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবাশিস দেব

ISBN-81-7079-664-4

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৪

শ্রীমতী গৌরীরানী শী
কল্যাণীয়াসু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

সুখ — ১
সুখ—২
সুখ—৩
গৃহসুখ
হাসি কান্না চুনী পান্না
সাত টাকা বারো আনা
গাধা
পুরানো সেই দিনের কথা
উৎপাতের ধন চিৎপাতে
কিশোর রচনা সম্ভার—১
কিশোর রচনা সম্ভার—২
বাঙালিবাবু
দাদুর কীর্তি
থ্রি-এক্স
শ্রীচরণকমলে
আন্দামান : ভারতের শেষ ভূখণ্ড
বড়মামার কীর্তি

সপ্তকাণ্ড

আমার ভূত

আমার ছেলেকে আমি সায়েব বানাবো।

রঙে নয়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে, সহবতে। আমি কালো। আমার ছেলে ঝুল-কালো। যখন হাসে, মনে হয় ভাল্লুকে শাঁকালু খাচ্ছে। বাপ হয়ে ছেলের সমালোচনা করা উচিত নয়। বউ ফর্সা, ছেলেটা এমন কেন আবলুস কাঠের মত হল? অভিজ্ঞরা বলেন, ভেব না, মেয়ে তোমার মেম হবে। ছেলেরা বাপের দিকে যায়, মেয়েরা মায়ের দিকে। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, কালো চোখের মণি! কালো জগৎ-আলো।

সায়েব পাড়ার ইস্কুলে ব্যাটাকে ভর্তি করতে হবে।

পয়সা যখন আছে, কেন করব না। কিন্তু পয়সায় তো আর নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না। সে অনেক হ্যাপা। শুনেছি শিশু যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে গর্ভসলিলে হেঁটমুণ্ডু, ঊর্ধ্ব-পুচ্ছ, তখনই নাকি ভাল স্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখাতে হয়। স্ত্রীর কানের কাছে চীৎকার করে ইংরেজি বই পড়তে হয়। পুরনো দিনের লেখকের লেখা চলবে না। হাল আমলের লেখক চাই। আমেরিকান লেখক হলে ভাল হয়। গোর ভাইডাল, সল বেলো, স্টেইনবেক। স্ত্রী ডাকলে হ্যাঁ বলা চলে না। বলতে হবে ইয়েস্! এমন কিছু বই পড়ে শোনাতে হবে যাতে ইয়াঙ্কি স্ল্যাং আছে। হ্যারলড্ রবিনস, হেডলি চেজ। এ সব করার উদ্দেশ্য, ভ্রূণের চারপাশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম তৈরি করা। মানে বনেদটাকে বেশ শক্ত করে গেঁথে তোলা।

আমার শ্যালিকা এ সব ব্যাপারে ভারী এক্সপার্ট। আমার

বউয়ের মত গাঁইয়া নয়। বহুকাল আগেই চুলে তেল মাখা ছেড়েছে। শ্যাম্পু করে করে চুলের চেহারা করেছে কি সুন্দর। মেরিলিন মনরোর মত। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। ঠোঁটে চকোলেট কালারের লিপস্টিক, তার ওপর লিপগ্লস। আজ পর্যন্ত, আমি একবারও ফ্যাকফ্যাকে ঠোঁট দেখিনি। অলয়েজ স্মার্ট। চোখে ব্ল্যাক প্যান্থারের চোখের মত বিশাল এক গগলস। সেকস্‌কে সোচ্চার করে রেখেছে। শাড়ি পরার অসাধারণ কায়দা কোথা থেকে সে রপ্ত করে রেখেছে। যেমন কোমর তেমনি তার কায়দার প্রদর্শনী। চীনে খাবার ছাড়া খায় না! মাঝে মধ্যে ফ্রাই খায়। সুপ দেখলে আমার বউয়ের মত 'মেগ্‌গে' করে ওঠে না। শুনেছি মাঝে-মধ্যে একটা দুটো বিড়ি-ফোঁকাও করে থাকে। নাইটি পরে শুতে যায়।

সেই মায়ের ছেলে পেট থেকে ড্যাডি ড্যাডি করে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কি আছে! শ্যালিকা বলে, সাজ-পোশাক, আহার-বিহারের ওপর মানুষের অনেক কিছু নির্ভর করে। বিকিনি পরলে বাঙালী মেয়েও, কিস মি কিস মি ডার্লিং বলে সি-বীচে ছুটতে থাকবে। শাড়ি পরলে, বলদ, গোয়াল, সাঁজালে, সিঁথির সিন্দুর, সন্ধের শাঁখ, এই সবই মনে আসবে। মনে আসবে ঘুঁটে, গোবর, গুল, গঙ্গাজল। দোজ ডেজ আর গন পাঁচু!

এখন বাইকের পেছনে বয় ফ্রেন্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে অফিসে যাবার যুগ পড়েছে। জীনসের পেছনে লেখা থাকে—Look here. সাঁঝের বেলায় আর সাঁঝাল নয়, পার্ক স্ট্রীটের আলো-আঁধারি, ঝকাঝম ঝকাঝম বারে বসে লাল ঠোঁটে, লাল পানীয়ের গেলাস।

আমার ছেলের মা সারাজীবন কি করে এল? ছাড়া শাড়ি পরে এতখানি একটা খোঁপা করে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলা। পেটে পুঁই শাক, লাউয়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, খোসা চচ্চড়ি। সেই মায়ের ছেলে ব্যাবা, ব্যাবা করবে না তো, কি করবে?

বউয়ের তো অনেক ধরন আছে। কেউ বউমা, মানে যার মধ্যে মা মা ভাবটা বেশ প্রবল। কেউ বধূ। যার মধ্যে কন্যাভাব প্রবল। কেউ শুধুই বউ, সাদামাটা ঘরোয়া একটা ব্যাপার। কেউ ওয়াইফ।

স্লিভলেস ব্লাউজ, অর্গান্ডির শাড়ি, সে এক আলাদা ব্যাপার। কেউ আবার মিসেস। একটু রঙ-চটা। দেহে তেমন বিন্যাস নেই, একটু এলোমেলো। বেঁচে থাকার ধরনটা গেলেও হয়, থাকলেও হয়। সংসার চলছে চলুক।

কথায় আছে, স্বভাব যায় না মলে, ইজ্জত না যায় ধুলে। ইজ্জত বলে না ইল্লত বলে কে জানে! একই মায়ের দুই মেয়ে। আমারটি এক রকম, শ্যালিকাটি আর এক রকম। ওই জন্যেই মানুষের উচিত শ্যালিকাকে বউ করে বউকে শ্যালিকা করা। সে তো আর হবার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে ফোঁস-ফোঁস করে জীবন কাটাই।

একদিন, দু'দিন ইংরেজি সিনেমায় নিয়ে গেলুম। ঘুমিয়ে ঘণ্টা পার করে দিলে। কি গো, ঘুমোচ্ছ কি, ছবি দেখ। অত বড় একজন অভিনেতা মারলন ব্রান্ডো।

মুখে সুপুরি ঠুসে কি যে ইংরিজি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না মাথামুণ্ডু।

বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কর। পরে আমাকে গল্পটা বলে দিও।

লাও, বোঝ ঠ্যালা।

দ্বিতীয়বার ঘুমের আয়োজন করতে করতে বললে, মোগলাই খাওয়াবে তো?

ওই এক শিখে রেখেছে, কলকাতায় এলেই মোগলাই। মোল্লার দৌড়।

কেন চাইনিজ খাবে চলো।

না বাবা আরশোলার গন্ধ।

ফিশ ফ্রাই।

না বাবা, হাঙরের তেলের গন্ধ।

আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ও সহজে ফয়শালা হবে না। এখন দয়া করে চুপ করুন, পরে বাইরে গিয়ে যা হয় করবেন।

ইস্! লজ্জার একশেষ। তারপর থেকে কোনও দিন আর বউকে কোনও ব্যাপারে চাপাচাপি করিনি! যা হবার তা হবে।

এখন ছেলেটা বেশ চড়কো হয়েছে, তাকেই মানুষ করার চেষ্টা করি।

অনেক ধরাধরির পর বেশ নামজাদা এক সায়েবী স্কুল থেকে একটা ভর্তির ফর্ম মিলল। আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। ফর্ম জমা পড়বে, তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। রেজাল্ট দেখে দশজনকে নেওয়া হবে।

এইটুকু ছেলের কি পরীক্ষা হবে। মুখে এখনও আধো আধো বুলি। কোমর থেকে প্যান্ট খুলে পড়ে যায়। কেউ কোনও উলটোপালটা কথা বললে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়।

ওই আঁচড়ানো-কামড়ানোটাই ভয়ের। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে যদি কামড়ে দেয়, সারা জীবনের মত হয়ে গেল। নারসারি রাইম আর পড়তে হচ্ছে না। দুলে দুলে পড়ে যাও, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। পাড়ার বাংলা স্কুলে ইস্তিরি চটকানো জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে কেরানিগিরি কর। পিণ্ড চটকানো ভাত, ঢ্যাঁড়স ভাতে কাঁচালঙ্কা দিয়ে বাকি জীবন গিলে মর।

ছেলেকে খুব তালিম দিতে থাকলুম মাসখানেক ধরে। পাখির ইংরেজি, বার্ড। সাহেবরা উচ্চারণ করে ব্যার্ড। টিকটিকির ইংরেজি গেকো। পাখিটি—দ্য বার্ড, স্ত্রীলোকটি, দ্য উওম্যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? মানুষ কবে চাঁদে গিয়েছিল? কি তাঁদের নাম? সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। আমি স্যান্ডউইচ খাই, আই ইট স্যান্ডউইচেস। স্যান্ড মানে বালি, উইচেস মানে ডাইনীরা। আগামী কাল, টুমরো। হাড়ের ভেতর থাকে মারো। টুম্যারো। গতকাল ইয়েসটরডে। বলো বাবা, বলো। মানিক বলো! না, মানিক বড় সেকেলে, বাংলা নাম। বলো জ্যাকি, বলো! আমি ভাল ছেলে, আই অ্যাম এ গোড, গোড না গুডই বলো, আই অ্যাম এ গুড বয়!

পরীক্ষার দিন সাত সকালে স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে গেলুম পরীক্ষা দেওয়াতে। কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা রাস্তায় দাঁড়ান, অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ছেলেও শালা তেমনি। নিজের ছেলেকে কেউ শালা

বলে। রাগে বলে। সে ব্যাটা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় চেঁচাতে লাগল, না আমি যাব না।

বলতে চেয়েছিলুম, ডোন্ট বি ফাসসি জ্যাকি। রাগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভুতো, মারব এক চড় রাসকেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফাদার কিচলু। তিনি বললেন, ও, দ্যাটস নট দি ওয়ে।

কি করব ফাদার। রাগে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

ওঃ নো নো, খুন চাপিলে চলিবে না! বি সফ্‌ট, বি এ ফাদার, নট এ বুচার।

কাম, মাই সান। মাই লিটল হোলি চাইলড।

ফাদার জানোয়ারটার কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিশনারি কায়দায় কাছে টেনে নিতে চাইলেন।

কোন্ মাল থেকে কি মাল বেরিয়েছে জানা ছিল না। ভুতো তার পুরনো দাওয়াই ছাড়ল। ঘ্যাঁক করে ফাদারের ডান হাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

ও গড, হি ইজ এ লিটল সেটান, অ্যান আগলি ডার্লিং। আই নিড সাম অ্যান্টিসেপটিক, এ টেট ভ্যাক।

টেট ভ্যাক লাগবে না ফাদার। ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া আছে।

অ্যান্টির‍্যাবিজ দিয়েছিলেন কি?

সে তো কুকুরকে দেয় ফাদার।

হি ইজ মোর দ্যান এ ডগ।

আমি ওকে একটা কষে চড় মারতে পারি ফাদার! ভীষণ রাগ হচ্ছে।

নো নো ডোন্ট ডু দ্যাট। একটি চড় আপনি আপনার গালে মারুন।

কামড়াবার পর ছেলে একটু শান্ত হল। ফাদারের গাউনের ঝোলা বেল্ট ধরে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল। আহা চেহারার যা ছিরি হয়েছে। তখন অত করে বারণ করলুম, ভদ্রমহিলা শুনলেন না, চোখে কাজল পরাবার কোনও

প্রয়োজন ছিল! সায়েবদের ছেলেরা কাজল পরে? সারা মুখে কাজল চটকেছে। ভাগ্যিস, ভূতের মত গায়ের রঙ, তা না হলে কি সুন্দরই না দেখাত!

স্কুলবাড়ির দিকে তাকিয়ে দুজনে গাছতলায় বসে রইলুম পাশাপাশি। শালির ছেলেটা কি স্মার্ট! এই বয়েসেই ইংরেজি গালাগাল দিতে শিখেছে! আধো আধো ভাষায় কি সুন্দর লাগে শুনতে! ও ছেলে বিলেত যাবেই। ওই জন্যেই লোকে মেম বিয়ে করে। ছেলেটা অন্তত সায়েব হবে! আমার বউটাকে দেখ! ঠিক যেন শাড়ি-জড়ানো প্যাকিং কেস! প্যাকিং কেস থেকে ভূতই বেরবে।

সারা স্কুলবাড়িটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। অসংখ্য শিশু কাঁদছে। হাজার রকম সুরে। ঠিক যেন শুয়োরের খোঁয়াড়ে আগুন লেগে গেছে! কি হল রে বাবা। সব অভিভাবকই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কান্নার পরীক্ষা হচ্ছে নাকি! পরীক্ষক হয় তো প্রশ্ন করেছেন—হাউ টু ক্রাই। একটু পরে হয়তো হাসি শোনা যাবে। যাক বাবা, এই একটা আইটেমে আমার ছেলে ফুল মার্কস পাবে। কেউ হারাতে পারবে না।

এক বাঙালী ভদ্রলোক আমার ছেলেকে চ্যাংদোলা করে স্কুল-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, ব্যাটা হাত পা ছুঁড়ে চেলাচ্ছে দেখ। কানের পোকা বেরিয়ে আসবে।

নিন মশাই, আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। নিজে কেঁদে সব ছেলেকে কাঁদিয়ে এসে ছ। নিয়ে যান, নিয়ে যান!

এসো বাবা এসো, কে মেরেছে বাবা!

মায়ের আদিখ্যেতা শুরু হল। আদর দিয়ে বাঁদর হয়েছে। দুচোখ বেয়ে কালো জল পড়ছে। ভূতের কান্না তো, কালোই হবে!

ওটাকে নর্দমায় ফেলে দাও!

আহা, বাছা আমার! ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রাসকেল আমার।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল্লুম—চল, তোর আর সায়েব হয়ে দরকার নেই। তুই বাঙালীই হবি চল।

তোয়াজ

শচিন আর শচিনের মেয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছে। ছুটির দিন বাপ আর মেয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসে। শচিন চল্লিশ পেরিয়ে সামনের কার্তিকে একচল্লিশে পড়বে। শচিনের মেয়ে শুভার বারো চলছে। মেয়েটির বেশ কথা ফুটেছে। সব সময় কথার খই ফুটছে মুখে। আজকাল মায়ের কাজকর্মের সমালোচনা করারও সাহস হয়েছে। মাঝে মধ্যে চড়-চাপড়ও খায় এর জন্যে। তবু বলতে ছাড়ে না। শচিন অবশ্য মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। করলে কি হবে, শুভার মার আবার রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না।

শুভা ডালের বাটিটা দেখিয়ে বাবাকে বললে, 'চেহারাটা দেখেছো ?'

শচিন আগেই দেখেছে। একবাটি কালচে জল। মনে মনে সে যা ভেবেছিল, মেয়ের মুখে সেই ভাবনাটাই কথা হল।

শচিন বললে, 'মালটা কি বল তো ?' শচিন এই ভাবেই কথা বলে।

'মালটা হল মার হাতের বিখ্যাত মুগের ডাল।'

'কি দিয়ে এরকম চেহারা করে বল তো ?'

'জিজ্ঞেস কর না।'

শচিন একটু থমকে গেল। অলকাকে ডেকে ডাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই ব্যাপারটাকে অনেক দূর গড়াতে দেওয়া। কেঁচো খুঁড়তে বড় বড় সাপ বেরোনো। খেতে বসে অশান্তি শচিন ভালবাসে না। মাসখানেক আগে অম্বলের অসুখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। শ' পাঁচেক টাকা ওষুধে পথ্যে বিধু ডাক্তারকে ধরে দেবার পরও অম্বল যখন কিছুতেই সারল না, জল খেলেও অম্বল, তখন

সুনীলবাবু শচিনকে ধরে নিয়ে গেলেন এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। সুনীলবাবু শচিনের সহকর্মী। সে ভদ্রলোকের অম্বলও কিছুতেই সারছিল না। মনস্তাত্ত্বিক ডক্টর এইচ এস ঘোষ তিনটে সিটিংয়েই সুনীলবাবুর সব অম্লরস মধুরস করে দিয়েছেন।

সেই ডক্টর ঘোষ শচিনকে বারবার বলেছেন, 'অম্বল, পেটের অসুখ, বুক ধড়ফড় প্রভৃতি সমস্ত অসুখের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পর্সেন্টই সাইকো-সোম্যাটিক ডিজিজ। মন চাইছে অসুস্থ হতে তাই দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মনটাকে কনট্রোল রাখুন। রোজ সকালে পট্টবস্ত্র পরে গীতাপাঠ করবেন, স্পেশ্যালি দ্বিতীয় অধ্যায়। মনের দাঁড়ে সব সময় একটি খুশি খুশি পাখিকে বসিয়ে রাখবেন, মনের আকাশ যে সব সময় গানে গানে ভরে রেখে দেবে। আর বাড়িতে একটা ফতোয়া জারি করে দেবেন, খাবার সময় স্রেফ স্ফূর্তি, কোনওরকম চেঁচামেচি, হইহই, ঝগড়া ঝাঁটি অশান্তি কিচছু চলবে না। প্রশান্ত মনে, তন্ময় হয়ে খাদ্যবস্তুকে আক্রমণ করবেন। খাবার সময় যাদের আপনি অপছন্দ করেন তাদের ধারে-কাছে ঘেঁসতে দেবেন না, তাদের কথা চিন্তাতে পর্যন্ত আনবেন না। পারলে, খাবার সময় রেকর্ড প্লেয়ারে কি টেপরেকর্ডারে হালকা কোন গান চালিয়ে দেবেন। মিউজিক। খাবার ঘরের দেয়ালটা উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে দেবেন। জানলায় ঝুলিয়ে দেবেন বাহারি পর্দা। ফুল রাখবেন, কিছু ফুল। আসল ফুল খরচে সামলাতে না পারলে প্লাস্টিকের ফুল। দূরে কোথাও বেশ ভাল একটা ধূপ জেবলে রাখবেন। হাওয়ায় গন্ধ ভেসে আসবে ফুরফুর করে। খেতে বসবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে। কেলে লুঙি কিংবা খেঁটে গামছা পরে খেতে বসা চলবে না। যুযুৎসু অথবা ক্যারাটে শেখার পোষাক দেখেছেন? লুজ ঢলঢলে ধবধবে সাদা। পরিবেশন যিনি করবেন, যদি স্ত্রী হন বলবেন ঝলমলে উজ্জ্বল শাড়ি পরে, গায়ে সেন্ট মেখে পরিবেশন করতে। যদি কাজের লোক রেখে থাকেন এবং সে যদি পরিবেশন করে, তা হলে কৃপণতা না করে তার কাপড় জামার পেছনে নিজের অম্বলের স্বার্থে বাড়তি কিছু খরচ করবেন। কথায় বলে পেটপুজো। সেই পুজোর আয়োজনে কোন

ত্রুটি থাকলে চলবে না। "আহার কর মনে কর আহুতি দি শ্যামা মাকে।"

শচিন মেয়েকে বললে, 'চেপে যা। যা পাবি চোখ কান বুজিয়ে খেয়ে যাবি! খুঁতখুঁতে স্বভাব ভাল নয়, বুঝলি? পেট ভরানো নিয়ে কথা।'

'তুমি কখন কি যে বল বাবা? এই সেদিন বললে ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, খাবারের রঙ গন্ধ এমন হবে, দেখলেই যেন ভেতরটা খাব খাব করে ওঠে। তুমি বললে, মাসকাবার হলে ভাল ভাল সব প্লেট ডিশ কিনে আনবে। ঝকঝকে চকচকে খাবার টেবিল তৈরি করাবে, চারখানা চেয়ার।'

তোর জন্যেই তো কেনা গেল না।'

'আমার জন্যে?'

শচিন ঠোঁটে আঙুল রেখে স স করে মেয়েকে সাবধান করে দিল। পাশের রান্নাঘর থেকে অলকা আসছে। দু'বাটি ডাল দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এইবার বাকি মালেরা একে একে আসছে। শচিনের মনে হল, প্রথম স্যামপেলটি যা ছেড়েছে তাইতেই আমরা কাত। তোমার বাকি কেরামতি যা যা বেরোবে, বোঝাই গেছে। হায় অলকা, যৌবনে মনযোগ দিয়ে রান্নাটা যদি একটু শিখতে! একেবারে গোয়ানিজ কুক হতে হবে একথা কেউ বলছে না; কিন্তু নিতান্তই মুখে দেবার মত একটা কিছু দাঁড় করাবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকত! আমি নিজেই যে তোমার চেয়ে ভাল রাঁধার ক্ষমতা রাখি। শচিন ভাবনাটাকে মাঝারি রকমের একটা গলাখাঁকারি দিয়ে মন থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করল। ডাক্তার ঘোষ বলেছেন 'বি চিয়ারফুল'। বি চিয়ারফুল।

'হুঁউউ গীত গাতা চল উঁউঁউঁ গীত গাতা চল', শচিন নখের টুসকি দিয়ে ডালের বাটির গায়ে একটু মিউজিকের মত কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা করল। কোথায় সুর! বেসুরো ডাল থেকে কি আর কাফী ঠুমরি বেরোয়! কেলে মত একটু ডালের জল মেঝেতে ছলকে পড়ল।

অলকা ভাতের থালাটা দক্ষিণী-নাচের মুদ্রার কায়দায় মেঝেতে

রাখতে রাখতে বলল, "পাঁচ টাকা কিলো, ফূর্তিটা ডালের বাটির ওপর না দেখিয়ে নিজের মনেই চেপে রাখার চেষ্টা কর। পাশেই কলাগাছ বড় হচ্ছে। বিয়ের খরচটা তোমার ঘোষ ডাক্তার যোগাবে না। তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।"

শুভা জিজ্ঞেস করল, 'বাটিতে এটা কি মা ?'

অলকা মেয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'খেয়ে দেখ। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।'

'এটা খাবার জিনিস কিনা সেটা তো আগে জানা দরকার।'

'চুউপ।'

অলকার 'চুপ' যেন বোমার মত ফাটল। শচিন চমকে উঠেছিল। শুভারও চোখ পিটপিট করে উঠেছে।

'বাপের আশকারায় একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। যা দোব মুখ বুজে খেতে পার খাও, না পার উঠে যাও। আমার কাছে অত খাতিরখুতির নেই।'

মায়ের চিৎকার আব আসন থেকে স্প্রিঙের মত মেয়ের লাফিয়ে ওঠাটা এমনভাবে মিলে গেল, শচিনের মনে হল, অলকার পায়ের চাপে স্প্রিং লাগানো একটা বাক্সের ডালা খুলে গেল। শুভা শচিনের পেছন দিক দিয়ে গুমগুম করে পা ঠুকে ঠুকে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা, মেয়ে দুজনেই সমান রাগপ্রধান।

শচিন ডাকল, 'শুভা, শুভা রাগ করিসনি মা, যাসনি, আয়।'

অলকা বললে, 'মা বলে আদর দিযে মাথাটা আর খেও না দয়া করে। পেটের জ্বালা ধরলে ঠিক এসে খাবে। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। তুমি খেয়ে-দেয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়। আজ বিকেলে কল্যাণী আসবে না। তোমাদের খাওয়া হলে সৃষ্টি বাসন নিয়ে বসতে হবে আমাকে।'

'তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। খেতে বসিয়ে শত্রুর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে নেই। মেজাজটা সব সময় এমন চড়াপদায় বেঁধে রেখেছ, সাপের মেজাজও হার মানে! কথায় কথায় ফোঁস!'

'হ্যাঁ কথায় কথায় ফোঁস! আমার মেজাজ ওই রকমই, জানই তো! আমি সব সময় তুমি মশাই, তোমার ন্যাজ মশাই করে চলতে

পারব না। আমার হল ধর তক্তা মার পেরেক। সংসার আমাকে কি দিয়েছে, কি দিয়েছে শুনি। সংসারে বলির পাঁঠা হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'পাঁঠা নয় বল পাঁঠী। রেগে যাও ক্ষতি নেই, গ্রামারে ভুল কর না।'

শচিন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, শরীরটা দু'ভাঁজ হয়েছে, শেষ ঠেলায় এইবার নিজেকে সোজা করলেই হয়, অলকা এক ধমক লাগাল, 'উঠছ কোথায়, উঠছ কোথায়, শুনি!'

'যাই মেয়েটাকে ধরে আনি। ও না খেলে আমি খাই কি করে?

'আহা মেয়ে সোহাগী রে! তোমার ভাবনা তুমি ভাব। মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার মেয়ে আমি বুঝব। অয়েল ইওর ওন মেশিন।'

ডক্টর ঘোষ বলেছেন, খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে ও পরে নিজেকে কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবেন না। কাম, অ্যাবসলিউট কাম, ভরা নদীর মত শান্ত তরঙ্গহীন। উত্তেজনা মানেই ভেগাস নার্ভের ছটফটানি, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড।

অ্যাসিড পেটের মধ্যে ছাড়া থাকতে থাকতে উদরের মিউকাস মেমব্রেন খেয়ে ফেলবে। দেখতে দেখতে জবরদস্ত আলসার, তারপর ফ্যাস করে একদিন পেটটা ফুটো করে দেবে। বাঁচতে যদি চান, জেনে রাখুন দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার?

ঠিক আছে বাবা, বাপ ঠাকুরদার আমলে বলত কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এ যুগে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। শচিন আবার ফোলডিং টেবিল ল্যাম্পের মত ভেঙে পড়ল। মাথাটা থালার ওপর হেঁট। পাশে মেয়ের আসনটা খালি। তার বয়সের মাপের ছোট্ট থালায় এক মুঠো ভাত, কয়েক টুকরো আলু ভাজা। গুলি গুলি কয়েকটা বড়ি ভাজা একপাশে গড়াগড়ি পড়ে আছে। শুভা রেগে আসন থেকে উঠে যাবার সময় আসনটা একটু গুটিয়ে গেছে। শচিন আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। ছোট্ট একটা মাছি থালার ওপর ভনভন করছে। এর নাম খাওয়া। সুখের আহার। ইংরেজের জেলখানায় স্বদেশীরা অনশন করত। পুলিশ হাতে ব্যাটন নিয়ে

সামনে এসে বসত, গলায় বাঁশ পুরে জোর করে খাওয়াত। এ যেন ছেলে পুলিশের বদলে মেয়ে পুলিশ। হাতে ব্যাটনের বদলে হাতা। সংসার কারাগারে স্ত্রীর হাতে স্বামী-নির্যাতন! এভাবে কি খাওয়া যায়? গলায় গাদা যায়! মেয়েটার মুখের ভাত পড়ে রইল, সে বাপ হয়ে কেমন করে খায়? তবু অশান্তির চেয়ে শান্তি ভাল। ডক্টর ঘোষ বলেছেন···।

খাবার আসনে শচিনকে দাবড়ানির প্যাঠা দিয়ে আটকে রেখে অলকা রান্নাঘরে গেছে পরের কেরামতিগুলো আনতে। যেমন ভাতের ছিরি, তেমনি ডালের ছিরি। ভাজা! ভাজায় আর কি কেরামতি থাকতে পারে! কম তেলে আধপোড়া। আহা! কোথায় গেল মায়ের হাতের আলু ভাজা! কোথাও এতটুকু বেশি কি কম ভাজা নেই। হালকা বাদামী রঙ! মুখে দিলেই মুচমুচ শব্দ! তেলের কালচে খাঁকরি লেগে নেই। অলকার ভাজা আলু যেন ভূতের খোকা। কাজল চটকানো খোকার মুখ। কৃপণরা কি আলু ভাজতে পারে! ভাজাভুজিতে দিল ছাই।

অলকা আবার এসেছে। উনুন থেকে সাঁড়াশি দিয়ে সরাসরি তুলে এনেছে কেলে একটা কড়া। তেল এখনও পিটপিট করে ফুটছে। এই দৃশ্যটা শচিনের কাছে ভীষণ ভীতিপ্রদ। তেলসুদ্ধ গরম কড়া সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কোনদিন যদি ধপাস করে সামনে পড়ে শচিনের নির্ঘাত মৃত্যু। গরম তেল ছিটকে চোখে-মুখে, সর্বশরীরে। চোখ দুটো তো যাবেই, সেই সঙ্গে মুখের চেহারা হবে চল্লিশ স্ক্রীনে ছাপা ব্লকের মত কালো কালো বিন্দু বিন্দু। বিয়ে করে বিল্বমঙ্গল। শচিন বহুবার স্ত্রীকে সাবধান করেছে, ওহে ভালমানুষের মেয়ে, তোমার এই বিপজ্জনক প্রথাটি দয়া করে ছাড়। কে কার কথা শোনে। চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। কথাই যদি শুনবে তা হলে স্ত্রী হবে কেন? প্রতিবারই অলকার এক উত্তর 'কড়া আমার হাতে। ভবিষ্যৎও আমার হাতে। ভাগ্যকে যেভাবে নিয়তি ধরে থাকে, আমার হাতের সাঁড়াশিও সেই-ভাবে কড়ার কানা ধরে আছে। কারুর বাপের সাধ্য নেই এখন কি হয় বলে।' ঠিকই তো? ভয়ে মরলেই সেক্সপিয়ার, কাওয়ার্ডস
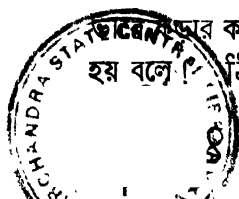
ডাই মেনি টাইমস, আর একটু এগোলেই রবীন্দ্রনাথ, মরতে মরতে মরণটারে। শচিন অবশ্য ভেবেই রেখেছে, সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়, নিয়তির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া যদি দড়াম করে মুখের সামনে পড়ে এবং চোখ দুটো যায়, তাহলে ওই মোড়ের মাথায় চেটাই পেতে সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে সামনে একটা কানা উঁচু থালা রেখে সারাদিন গান গাইবে, ভালবাসার আগুন জেবলে কেন চলে যাও। অলকা পাশে বসে এক হাতে মাথায় ধরে থাকবে রঙ-চটা ছাতা আর এক হাতে মাঝে মাঝে হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে। এই রকম একটি হতভাগ্য দম্পতিকে সে রোজই পথে দেখে। মাথায় ছাতা ধরবে! হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে! কে, অলকা! এমন দিন কি হবে মা তারা!

অলকা বাঁ হাতে ধরা সেই ভয়ঙ্কর তপ্তকটাহের ফুটন্ত শব্দায়মান তেল থেকে খুন্তি দিয়ে একটি ভাজা মাছের দাগা তুলে শচিনের ভাতের ওপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে বললে, 'সঙের মত বসে না থেকে দয়া করে খেয়ে উঠে যাও না। সংসারের পাট তো আমাকে চুকোতে হবে, না সারাদিন বসে থাকলেই চলবে!'

শুভার পাতেও অনুরূপভাবে একটি মাছের খণ্ড পড়ল।

শচিন না বলে পারল না, 'ওর পাতে শুধু শুধু দিচ্ছ কেন, ও তো খাবে না।'

'খাবে না মানে, ওর বাবা খাবে।'

শচিন ভাবলে ওর বাবা তো খাচ্ছেই, আর কিভাবে খাবে। পেঁকো ভাতের ওপর কেলে ডাল ঢেলেছে, ডাল আবার গলেনি। বাটির তলায় আঙুল চালিয়ে গোটা গোটা কিছু মুগের দানা তুলে এনে পিণ্ডের ওপর যেভাবে তিল ছিটোয় সেইভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছে, সতিল পিণ্ডোদকং সকাতলা মৎস্যং। এক টুকরো লেবু হলে মন্দ হত না। অলকাকে বলার সাহস নেই। শুভা থাকলে বলা যেত। সে তো এখন গোঁসাঘরে।

শোবার ঘরের রেডিওটা হঠাৎ বেজে উঠল। আহা নজরুলের সেই গানটা, 'জনম জনম গেল আশাপথ চাহি।' শুভা খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে মনের দুঃখে রেডিও খুলেছে। ডক্টর ঘোষ

বলেছেন, খাবার সময় একটু গান, একটু কনসার্ট।

হঠাৎ কনসার্ট থেমে গেলে। অন্য কনসার্ট কানে আসছে।

'শিগগির চল, শিগগির চল, এক থেকে তিন গুনব, তার মধ্যে সুড়সুড় করে উঠে আসবি। এক, দুই, তিন! উঠলি! কি হল উঠলি? ভাল কথায় উঠবি, না যাব? কি রে?'

'আমি খাব না, যাও।'

'বাপের পয়সা সস্তা দেখেছ, না? লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! ওঠ শুভা ওঠ, শুভা ওঠ বলছি। আমার মেজাজ কিন্তু আস্তে আস্তে চড়ছে। এবার বলতে গেলে আর মুখে নয় হাতে বলব।'

শচিন মুখটাকে বিকৃতি করল. মেজাজ চড়ছে! আর কোথায় চড়বে বাবা। তিনি তো সব সময় সপ্তমেই চড়ে আছেন। না, ডক্টর ঘোষ বলেছেন মনটাকে পারিপার্শ্বিক ব্যাপার থেকে তুলে রাখবেন। নিজেকে অনেকটা নিরোর মত করতে হবে। রোম পুড়ছে পুড়ুক, আপনি ছাদের আলসেতে বসে ব্যায়লা বাজাচেছন। তা না হলেই পরিপাকে বিপাক এবং অম্বল।

শয়নকক্ষে মা মেয়ের খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মায়েরই তো মেয়ে। দুজনেই একরোখা বুলডগ। বুলডগ কামড়ালে তার চোয়াল আটকে যায়। মাংস না খাবলে সে কামড় খোলে না। এদেরও তাই! এর গোঁ ওকে, ওর গোঁ একে কামড়ে ধরে আছে। মেয়ে খাবে না মাও ঘাড় ধরে খাওয়াবেই। দরকার হলে ল্যাং মেরে চিত করে ফেলে বাঁশ গেদে খাওয়াবে। অনশন ভঙ্গের দৈহিক ব্যবস্থা। ওরে আমার বুলু ডগুয়ারে। শচিনের শান্ত স্বভাবের ছিটে-ফোঁটাও যদি শুভার চরিত্রে লাগত! কি করে লাগবে। মেয়েদের শরীরে মায়ের রক্তই যে বেশি, তা না হলে মেয়ের বদলে ছেলে হত!

ঘাড় ধরে বেড়ালছানাকে যেভাবে তুলে আনে অলকা সেইভাবে শুভাকে ধরে এনে ধপাস করে আসনে বসিয়ে দিল।

'আর যেন একটা কথাও আমাকে না বলতে হয় শুভা। সেই সকাল থেকে রান্নাঘরে। এর মধ্যে ছ'বার চা হয়েছে। খিদেয় পেট

জ্বলে যাচ্ছে আমার। তোমাদের আর কি, খাবেদাবে ঘরে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি একটা মানুষ, ধোপার গাধা নই!' দাঁতে দাঁত চেপে গাধা শব্দটা অলকা এমনভাবে উচ্চারণ করল! অ্যাঃ মহিলার সমস্ত স্নায়ু ড্যামেজ হয়ে গেছে। কামড়ে না দেয়! দাঁতাল, মাতাল আর পাগল! বিশ্বাস নেই! খুব সাবধান।

শুভা হাত গুটিয়ে মুখ গোঁজ করে বেঁকে বসে আছে। খুবই স্বাভাবিক। শচিনের ছেলেবেলায় মাঝে-মধ্যে এইরকম ঘটনা অবশ্যই ঘটত। সেই সময়কার ভিকটোরিয়ান 'গোল্ডেন টাইমে' মায়েরা এই রকম পুলিশী প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বলতেন, চ বাবা, ওঠ মা; রাগ করিসনি। রাগী ছেলে কি মেয়ে বলত, না যাব না, না খাব না। মা মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতেন, চল বাবা, চল না। যাবি না তো! ঠিক আছে কাল সকালে আমাকে আর দেখতে পাবি না। কোথায় যাবে তুমি? দেখতেই পাবি, যমে নিয়ে যাবে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। ব্যাস, হাউ হাউ কান্না। না মা যেও না তুমি।

মায়ের ফর্সা সাদা কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ ঘামে আঁচলের ঘষায় একটু ছড়িয়ে গেছে। হাতে মিছরি-দানা চুড়ি। লাল পলা, সাদা শাঁখা পাশাপাশি। মাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। মা অমনি বলতেন, দূর পাগল, তোদের ফেলে যাব কোথায়! কার কাছে ভরসা করে রেখে যাব! কত কাজ বাকি! অসম্ভব তেতো নিমঝোলও তখন চুমুক দিয়ে খেতে আপত্তি নেই।

আর এখন? অ্যাঁ, কি যুগ পড়ল রে বাবা? মিলিটারি ক্যাম্পে মহিলা মেজর জেনারেলের সঙ্গে সংসার। সবসময় কুচকাওয়াজ চলেছে! শচিন মনে মনে বললে, 'এবার থেকে তুমি ইউনিফর্ম পরে হাতে ব্যাটন নিয়ে খাবার তদারকি কোরো। সেইটাই মানাবে ভাল।'

শচিন বললে, 'শুভা খেয়ে নে মা! কেন অশান্তি করছিস। দুপুর থেকেই মেঘ জমে জমে সন্ধের কালবোশেখী!'

'তুমি খাচ্ছ খাও। আমি খাব না। ওকে আমি দেখে নোব!'

'কাকে দেখে নিবি?

'তোমার বউকে।'

'হোয়াট! কি বললি?'

শচিনের 'হোয়াট' অলকার 'চুপ'-এর চেয়ে জোরে বেরল। রাগটাকে এতক্ষণ অনেক কষ্টে চেপে চেপে রেখেছিল। এইবার বোমা ফাটল।

অলকা পাশের ঘর থেকে ছুটে এল। হাতে একটা হাতা।

শচিন চিৎকার করে বললে, 'গেট আউট। তোমাকে খেতে হবে না। বড্ড বাড় বেড়েছে শুভা। মেয়েছেলে বলে তোমাকে আমি ছেড়ে দোব না রাসকেল। কানটাকে টানতে টানতে ছাগলের কানের মত লম্বা করে ছেড়ে দোব স্কাউনড্রেল।'

মায়ের বকুনি শুভার তেমন গায়ে লাগে না। খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত। বাপের ধমকধামকে ঠোঁট ফুলে যায়। অনেকদিন পরে শচিন ক্ষেপেছে। শুভার চোখে অভিমানের জল। শচিন সে সব তেমন গ্রাহ্য করল না।

হাত উঁচিয়ে দরজার গোড়া থেকে অলকা বললে, 'শুধু শুধু মেয়েটাকে বকছ কেন। হঠাৎ আবার কি হল। এই তো দেখে গেলুম মেয়ের সোহাগে উলটে পড়েছ।'

'তোমার ট্রেনিং-এ এই বয়সেই ইনি গোল্লায় গেছেন। যেমন মা তার তেমনি মেয়ে!'

'যা বলবে মুখ সামলে বলবে। মেয়েকে হচ্ছে হোক, মাকে ধরে টানাটানি করবে না।'

'ওই তো, ওই তো তোমার বচনের ছিরি! সাইকোলজিস্টরা কি বলেন জান, ছোটরা সব সময় বড়দের চালচলন নকল করে. বিশেষত মায়েদের। শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না মায়ের মত মা হতে হয়। ত্যাগ, তিতিক্ষা, লজ্জা, মাত্রাবোধ, তাল, লয় সব শিখতে হয়।'

'জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না। রাখ তোমার সাইকোলজিস্ট। অতি আদর. আশকারা, রিরংসা এসব সংযত করে বাপের মত বাপ হতে হয়।'

'রিরংসা জিনিসটা কি?'

'ডিকসেনারি দেখে নিও। শুভা, থালাটা নিয়ে তুই এ ঘরে উঠে আয়। আর কাঁদতে হবে না। আয় আমার পাশে বসে খাবি আয়। আর একটু মাছ, ঝাল দোব। আয় উঠে আয়।'

'ওকে উঠতে হবে কেন? আমিই উঠে যাচ্ছি। আনওয়ান্টেড এলিমেন্ট আমি।'

শচিন তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল। চালতার অম্বলটা একটু চেখে দেখার লোভ ছিল। না খেয়েছে ভালই হয়েছে। অ্যাসিডে অ্যাসিড বাড়ে।

দুই

সোমবারটা এমনিই ভারী বিশ্রী। ব্ল্যাক মানডে। সকালে গা ম্যাজম্যাজ করে। বেরোতেও গড়িমসি হয়ে যায়। ট্রাম, বাস কেমন ঢিমে-তালে চলে। সংখ্যাতেও কম মনে হয়। ক্যাটকেটে রোদ, ভিড়, ঠেলাঠেলি। তার ওপর কাল থেকেই অলকার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। কথাবার্তা সব তৃতীয় পুরুষে দেওয়াল কিংবা আলমারিকে উদ্দেশ করে হচ্ছে—'খেতে দিলে হয়, আন্ডারওয়্যারটা আবার কোন চুলোয় ফেলেছে, মানিব্যাগটার পাখা গজালো না কি!' চুড়ির রিনিঝিনি মেশানো অলকার সরোষ উত্তর, 'বল, যে-চুলোয় থাকে সেই চুলোতেই আছে, একটু চোখ মেলে দেখতে।'

'রুমালটা আবার দয়া করে কে হাওয়া করে দিলে?'

'কেউ হাওয়া করেনি নিজের প্যান্টের পকেটটা ভাল করে দেখলেই পাওয়া যায়।'

'যাঃ বাবা একপাটি জুতো আবার কোথায় গেল?'

'কোথাও যায়নি, র‍্যাকের পাশে পড়ে গেছে। যেমন রাখার ছিরি!'

'ও, পড়ে গেলে তুলে রাখতে নেই? হাতে পক্ষাঘাত?'

'হ্যাঁ পক্ষাঘাত। যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে হবে। আর্সির মুখ দেখা।'

শচিন ঝুলতে ঝুলতে অফিসের টেবিলে এসে বসছে। ঘেমে নেয়ে, আধকপালে হয়ে, আধমরা অবস্থা।

ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেল। কাজ দেখলেই রাগ ধরছে। পেটটাও ভুট-ভাট করছে। ঢেঁড়সের ঢেঁকুর উঠছে। অন্যদিন ড্রয়ারে একটা দুটো অ্যান্টাসিড থাকে, আজ তাও নেই। ভোগাবে। ঢেউ ঢেউ করে আর গোটাকতক ঢেঁকুর তুলল। মাথাটা বেশ জম্পেশ ধরেছে। ধরবেই। মাথার আর দোষ কি! কথায় বলে মুড়ি আর ভুঁড়ি। অম্বল হলেই মাথা ধরবে। শচিন নাকের উপর কপালের কাছটা দু-আঙুলে টিপে চুপ করে বসে রইল। রাসকেল পেট, রাসকেল ডাক্তার। কোন অসুখই সারাবার ক্ষমতা নেই, কেবল ফি গুনে দিয়ে যাও।

সুনীলবাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'হল কি? এত করে বললুম খাবার পর একটা করে পান খাবেন, চুনে ক্যালসিয়াম, ভাল অ্যান্টাসিড, পানের রসে ক্লোরোফিল···।

'ধ্যার মশাই ক্লোরোফিল, ক্যালসিয়াম। ভেতরটা চুনকাম করে দিলেও কিছু হবে না। সংসারটাই অম্বলে অম্বলে অ্যাসিড হয়ে গেছে।'

'চলুন আজ ডক্টর ঘোষের কাছে। আমিও যাব, একটা কেস আছে। আপনার চেয়েও জটিল। সেও ওই স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনা।'

'হ্যাঁ যাব। আজই শেষ। হয় এসপার না হয় ওসপার।'

'আরে মশাই, অত সহজে হাল ছাড়েন কেন? কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নিন একটা পান খান। আজ আর চা খাবেন না। স্রেফ জল চালিয়ে যান। হাইড্রোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। এই সুরেন, শচিনবাবুর গেলাসটা ভরে দাও।'

টিফিনে সুনীলবাবু শচিনকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাস্তা কচুরি খেলেন। হজম করায় মন! মনই লিভারকে নাচায়।

সুনীলবাবু বললেন, 'দেখেছেন কাণ্ড, জল পর্যন্ত যার পেটে তলাযনা সে আজ প্লেন কচুরি নয়, একেবারে খাস্তা কচুরি খাচ্ছে।'

শচিন ফাইল দেখতে দেখতে বললে, 'আমার বউটাকে বোবা আর কালা করে দিতে পারলে আমিও হেসে হেসে খাস্তা কেন কবিরাজী কাটলেট খেতুম।'

তিন

ডক্টর ঘোষের চেম্বার ফাঁকাই ছিল। থাকেও তাই। কার দায় পড়েছে পয়সা খরচ করে ছত্রিশ গণ্ডা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে সাধ করে আসতে। একটাই সুবিধে, বেশ আরাম করে বসার জন্যে পুরু পুরু গদি আঁটা ভালো ভালো চেয়ার আছে যা অন্য ডাক্তারখানায় থাকে না।

ডক্টর ঘোষ সব শুনলেন। শুনেটুনে বললেন, 'পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। দাম্পত্য জীবনের কয়েকটা বেসিক ডিসিপ্লিন আছে। সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলার ওপর শান্তি নির্ভর করছে। এই তো হার্লাফল একটা কেস ভাল করে দিলুম।'

শচীন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেসটা শোনার কোন উৎসাহ-ই নেই তার। পয়সা খরচ করে যত বাজে গালগল্প শুনতে আসা। সুনীলবাবুর খুব উৎসাহ, প্রশ্ন করলেন, 'কি কেস?'

'জানালা খোলা। মাথার দিকের জানালা খোলা নিয়ে চোদ্দ বছরের ঝামেলা, বদহজম, নার্ভাস, ব্রেকডাউন। স্ত্রী জানালা খুলে শোবেন, স্বামী বন্ধ করবেন। ইনি খোলেন তো উনি বন্ধ করেন। সারারাত ওই চলে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি ধরে দুজনের সারারাত হাত কাড়াকাড়ি। ঘুমের বারোটা। প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম মজা, বিরক্তি, প্রতিবাদ। ভদ্রলোক কোথায় পড়েছেন মাথায় সরাসরি হাওয়া লাগলে সাইনাস হয়। সিটিংয়ের পর সিটিং, কিছুই করতে পারি না। দুপক্ষই সমান। গোঁ জেতে কি সাইকোলজি জেতে! শেষে···।'

'শেষে কি হল?' সুনীলবাবু যেন রহস্য-গল্প শুনছেন।

'শেষে সাইকলজির বাইরে যেতে হল।'

'কি রকম ?'

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ভদ্রলোককে বললুম, একদিন আপনি সারারাত জানালাটা খোলা রাখতে দিন। প্রয়োজন হলে নিজে মাঙ্কিক্যাপ পরে অলীক সাইনাস থেকে বাঁচুন। একটা দিন। ভদ্রলোক রাজি হলেন। ব্যাস হয়ে গেল।'

'কি হয়ে গেল ?'

'চোদ্দ বছরের ঝামেলা মিটে গেল। এখন স্ত্রী সবার আগে জানালা বন্ধ করে দেন।'

'কেন ?'

'সেদিন রাত দুটো নাগাদ অ্যাপ্রন পরে নিজেই গেলুম। রাস্তার ধারে একতলার ঘর। রকে উঠলুম। জানালা দিয়ে আমার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে ভদ্রমহিলার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরেই দে দৌড়।'

সুনীলবাবু হি হি করে হাসলেন। শচিনের হাসি পেল না। শচিনের তো জানালা-কেস নয়। আরও ঘোরালো জোরালো ব্যাপার।

সুনীলবাবুই শচিনের মুখপাত্র। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁর ব্যাপারটা তাহলে কি হবে ? এইভাবেই চলবে ?'

'এঁর ব্যাপারটার একমাত্র সমাধান প্রেম। প্রেম করতে হবে। প্রেম দিতে হবে।'

'এই বয়েসে প্রেম ? মেয়ে পাবে কোথায় ? এখন মার্কেটে যে সব ছেলে ঘুরছে তাদের হাত থেকে মেয়ে বার করা শক্ত হবে না ?'

'প্রেম মানেই কি পরকীয়া ! নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই প্রেম।'

শচিন এইবার লাফিয়ে উঠল, 'ওই বউয়ের সঙ্গে প্রেম ? কারুর বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না। সবসময় বাঘিনীর মত গর্জন করছে।'

'বাঘিনীকেও পোষ মানাবার কায়দা আছে। সার্কাসের রিং-মাস্টার দেখেছেন তো! বউকে একটু তোয়াজ করবেন। রোজ গীত-গোবিন্দ পড়বেন। মোলায়েম করে বলবেন, দেহি পদপল্লবমুদারম। আদর করে কখনও পিঠে, কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন,

সুড়সুড়ি দিয়ে দেবেন। গালে দু চারটে ঠোনা মারবেন। ট্যাবলেট নয়, নিয়ম করে রোজ একটা দুটো চুমু খাবেন।'

'চুমু ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চুমু, চুম্বন। ওর চেয়ে ভাল অ্যান্টাসিড আর কিছু নেই। না জানা থাকলে গোটাকতক ইংরেজি সিনেমা দেখে শিখে নেবেন। আমাদের দেশের দোষই হল, মেয়েদের শরীরের নিচের দিকেই আমাদের নজর। কিন্তু ঊর্ধ্বাংশটাই হল আসল। শুরু হবে ওপর থেকে। ডিভাইন লাভ, ডিভাইন লাইট ওপর থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। প্রেম কি মশাই ধর তক্তা মার পেরেক! সব কিছুর একটা মেথড আছে, অ্যাপ্রোচ আছে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমই হল বেস্ট প্রেম, সিকিওর্ড প্রেম, খোঁটায় বেঁধে প্রেম। প্রেমের অবজেকট সহজে পালাতে পারবে না। ইঁদুর-কলে পড়ে গেছে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হলে পরস্ত্রী ভেবে নেবেন। নিজেকে মনে করবেন কৃষ্ণ, চলেছেন রাধার কাছে অভিসারে।'

'ইমপসিবল।'

'ওই তো দোষ। অহংটাকে খাটো করা যায় না? আত্ম-সমর্পণ, সারেন্ডার। বিল্বমঙ্গল যদি পেরে থাকে, হোয়াই নট ইউ! সিকির সিকি প্রেমই হল আমার প্রেসক্রিপসান। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে বউয়ের মুখে একটু মিষ্টি গুঁজে দেবেন। ভালো শাড়ি পরিয়ে পার্কে পাশাপাশি বসে কোলের ওপর হাত নিয়ে খেলা করবেন। আঙুলের আংটি ঘোরাবেন। চীনেবাদাম ঝালমুড়ি কিনে দেবেন। ফুচকা খাওয়াবেন। আড়ালে ঝোপঝাপ দেখে পাশাপাশি বসে মাথাটা কাঁধে হেলিয়ে দেবেন। ইডেনে গেলেই এ দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম প্রথম কপি করবেন। কপি করতে করতেই অরিজিন্যালিটি এসে যাবে। দিন কতক এইভাবে তোয়াজ করে দেখুন শান্তি ফিরে আসবে। মুখের ওই দুশ্চিন্তা গ্রস্ত বুড়োটে ভাব কেটে যাবে। যান, বি চিয়ারফুল! মনে রাখুন অম্বল আর বদহজমের দাওয়াই অ্যান্টাসিড নয়, প্রেম।'

দুজনে চেম্বার ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

সুনীলবাবু বললেন, 'তাহলে একটা গীতগোবিন্দ আর বিল্ব-

মঙ্গল কিনে ফেলুন। নতুন জীবন আজই শুরু করুন। একটা কামসূত্রও সঙ্গে কিনে ফেলতে পারেন। ডাক্তারে, ওষুধে তো বহু পয়সা দিলেন আরও কিছু না হয় এদিকে যাবে। দেখতে দোষ কি ? আচ্ছা আমি চলি কাল দেখা হবে। গুডবাই।'

শচিন গুটি গুটি হাঁটা ধরল। আবার বাড়ি আবার সেই দেওয়ালকে উদ্দেশ করে ঠারেঠোরে ছিটে গুলির মত কথা ছুঁড়ে মারা। মেয়ের সঙ্গেও কথা বন্ধ, এভাবে আর কতদিন চলবে প্রভু ! শচিন সেই অদৃশ্য প্রভুর কাছে পরামর্শ চাইল। কোথায় প্রভু ! ঊর্ধ্বশ্বাসে মানুষ ছুটছে। ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে গাড়ি দৌড়োচ্ছে। দুঃখী শচিনের দিকে কারুর নজর নেই। অসার সংসার, নাহি পারাপার। আচ্ছা দেখাই যাক না ডক্টর ঘোষের নতুন দাওয়াই কাজে লাগিয়ে। অহং-এর ভাগটাকে একটু নিচু করে স্ত্রীর উদাসীনতার অগাধ জলে স্পর্শ করিয়ে স্নেহের কণা কিছু তুলে আনা যায় কিনা। আমার বউ। আহা, আমার প্রেমের বউ ! আহা, আমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। বউকে স্নেহ করার জন্যে শচিন নিজেকেই তোয়াজ করতে লাগল। স্নেহকে, প্রেমকে এখন দৃশ্যমান করতে হবে। তেমন রেস্ত থাকলে একটা হীরের আঙটি কেনা যেত। তেমন রেস্ত থাকলে একটা শাড়ি। পকেট তো গড়ের মাঠ। মধ্য-মাসে কেরানীর পকেটের আর কত জোর থাকবে। অলকা একসময় কড়াইয়ের চপ খেতে ভালোবাসত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম নতুন বউকে সে কত খাওয়াত। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে হু হা করে ঝালঝাল চপ খাবার সেই দৃশ্য হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। নাকের ডগায় শিশিরের দানার মত ঘাম। আয় পুরনো দিন ফিরে আয়।

চার

কড়াইয়ের চপ নিয়ে শচিন বাড়ি ঢুকছে। ঢুকতে ঢুকতেই শোবার ঘর দেখতে পাচ্ছে। জানালা খোলা। ফন ফন করে পাখা ঘুরছে। পায়ের ওপর পা জড়িয়ে অলকা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ওরে আমার মহারানী রে ? বাস ঠেঙিয়ে ধস্তাধস্তি করে সারা দিনের পর

একটা লোক বাড়ি ফিরছে, কোথায় জানালার সামনে বিরহিনীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে, হাসিমুখে এগিয়ে আসবে, বলবে, আহা তুমি এলে, বাছারে! তা না, উনি শুয়ে শুয়ে মৌজ করে উপন্যাস পড়ছেন। ফায়ার। না না, আজ আর ফায়ার নয়, দাঁতে দাঁত চেপে সিজফায়ার।

শচিন একটু কাসল। অলকা বই থেকে চোখ না সরিয়ে শুয়ে শুয়েই বললে, 'শুভা দরজাটা খুলে দে।' ও! শুভা দরজা খুলবে, আপনার হাতে কি পক্ষাঘাত। এ যেন শচিন আসেনি, এসেছে কাজের লোক। না, নো রাগারাগি। শচিন ঢুকে পড়ল, 'একবার দয়া করে উঠে এসে এটা ধর না।'

দয়া করে শব্দটা না বললেই হত। সোজাসুজি বলা যেত, ওগো একবার উঠে এস তো। যাক মুখ ফসকে যা বেরিয়ে গেছে তা বেরিয়েই গেছে।

'শুভা, কী ধরতে বলছে ধরত!'

ও, তবু নিজের ওঠা হয় না।

'কী এমন ব্যস্ত, নিজে উঠতে পারছে না!' অতিকষ্টে শচিন পরের শব্দ কটা ধরে রাখল—গতরে কি শুঁয়োপোকা ধরেছে!

ধপাস করে বইটা পাশে ফেলে বেজার বেজার মুখে অলকা উঠে এল, 'কী হল কী?'

শচিন হাসির রেখা টেনে পরম উৎসাহে বললে, 'গরম গরম, একেবারে গরম গরম কড়াইয়ের চপ।'

'কী হবে?'

'কী হবে মানে?'

'তুমি খাবে? তোমার তো অম্বলের ব্যামো!'

'আমি কেন? তুমি খাবে!'

'আদিখ্যেতা!'

'তার মানে?'

'রোজই তো শুধু হাতে ঢোক, হঠাৎ আজ পিরিত উথলে উঠল কেন?'

'ও পিরিত? কোন দিন কিছু আনি না, না?'

'মনে তো পড়ে না। তোমার চপ তুমি খাও।'

এই সময় শচিনের উচিত ছিল বউকে এইটুকু সোহাগ করা, তার বদলে সে ঠোঙাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'রাবিশ! নৃশংস রাবিশ!'

'হ্যাঁ রাবিশ।'

'অফ কোর্স রাবিশ, হৃদয়হীন রাবিশ!'

'জানই তো। জেনে শুনে ঘাঁটাতে আস কেন? কেঁচো খুঁড়তে গেলেই সাপ বেরোবে।'

'বেরোক। তাই বেরোক।' শচিন চপের ঠোঙায় মারল লাথি। ঠোঙা ছিঁড়ে সব চপ ছত্রাকার।

'পয়সা তোমার অনেক, মারো, মারো লাথি, কার কী?'

'সংসারের মুখে লাথি।'

'নতুন কি, সে তো দুবেলাই চলছে।'

'দুবেলাই চলছে?'

'হ্যাঁ চলছে। বেরোতে লাথি আসতে লাথি।'

'যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে।'

'কী তোমাকে দেখানো হয়েছে!'

'আদর করে চপ নিয়ে এলুম, দিলে ফেলে!'

'আমি ফেলে দিলুম, না তুমি ফেলে দিলে?'

'ওই হল।'

'বিষাক্ত তেলেভাজা আজকাল কেউ খায় না। পারতে শ্যামাদির স্বামীর মত ইলিশ নিয়ে, সিনেমার টিকিট, কি থিয়েটারের টিকিট, কি কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার টিকিট নিয়ে বাড়ি ঢুকতে—বুঝতুম মুরোদ! আজ চোদ্দ বছরে একবার চিড়িয়াখানা দেখাতে পারলে না। মেয়েটাকে প্রত্যেক বছর আশা দিয়ে দিয়ে রাখা। এ বছর হল না মা, আসছে বছর। সেই আসছে, সেই আসছে বছর চোদ্দ বছরেও এল না। এই তো মুরোদ।'

কড়াইয়ের চপের লড়াই গড়াতে গড়াতে অনেক দূর গড়িয়ে গেল। শচিন পা থেকে জুতো দুপাটি খুলে র‍্যাকের দিকে ছুঁড়ে দিল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হিড়হিড় করে টেনে-টুনে পা থেকে

নাইলনের মোজা খুলল। গা থেকে জামাটা খুলে চেয়ারে ছুঁড়ে মারল। বুক পকেট থেকে এক গাদা টুকরো-টুকরো কাগজ খানকতক ময়লা ময়লা নোট ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। থাক পড়ে। শ্যামাদির স্বামীর মত মুরোদ দেখাতে পারলে অলকা সব তুলে গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখত।

অনেক রাতে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে শচিন নিজেকে শ্যামাদির স্বামীর সঙ্গে মেলাতে বসল। প্রতিবেশী। দু'বেলাই শচিনের সঙ্গে দেখা হয়। লুঙ্গিটাকে উঁচু করে পরে সকালে ঘোঁত ঘোঁত করে বাজারে ছোটেন। শচিন মাঝেসাঝে বাজারে যায়। রোজ সকালে বাজার যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ন'টা নাগাদ আদ্দির পাঞ্জাবি পরে ঘাড়ে একগাদা পাউডার মেখে মুর্গী-হাটায় ব্যবসা করতে যাওয়া। হবে না, শচিনের দ্বারা হবে না। ও সাজে সাজা যাবে না মা! মোড়ের মাথায় পানবিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে শ্যামাদির স্বামী বেরোবার সময় এতখানি একটা হাঁ করে দু'খিলি পান এক-সঙ্গে মুখে পোরেন! তারপর রিকশায় ওঠার আগে কোনও দিকে না তাকিয়ে পচাৎ করে এক ধাবড়া পিক ফেলেন। হবে না, শচিনের দ্বারা ও কাজ হবে না। ছুটির দিন মেয়ের ঘাড়ে সংসার ফেলে দিয়ে বউ বগলে শ্যামাদির স্বামীর যে কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে যাওয়া চাই। যে কোনও সিনেমা বা থিয়েটার শচিনের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। হিন্দী ছবির ননসেন্স বাঙলা থিয়েটারের ক্যাবারে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের সহ্য শক্তির ওপর অত্যাচার। শালীদের বাড়ীতে এনে ছত্রিশবার বাজারে ছোটা, হই হই করে হাসির মস্করা, টাকার শ্রাদ্ধ, শচিনের সে ক্ষমতাও নেই, রুচিও নেই। বোকা বোকা কথা বলে হ্যা হ্যা করে হেসে মেয়েদের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা শচিনের নেই। শান্ত মানুষ, শান্তিতে থাকতে চায়। বউ পেয়েছে তাইতেই খুশি, শালাশালী নিয়ে ঢলাঢলির ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। এক মেয়েছেলেতেই কাহিল-কাহিল অবস্থা, আর মেয়েছেলেতে কাজ নেই। শ্যামাদির স্বামী ভালো শাড়ি দেখলেই বউয়ের জন্যে কিনে আনেন, কথায় কথায় গহনা গড়িয়ে দেন, দিতেই পারেন। ব্যবসার পয়সা। টাটা

আরও দেন, বিড়লা গোয়েঙ্কা দিতে পারেন। শচিনকে দিতে হলে চুরি করতে হবে।

অলকার দিকে পেছন ফিরে শচিন চিত থেকে কাত হল। গায়ে হাত দিলেই খ্যাঁক করে উঠবে। শ্যামাদির স্বামী না হতে পারলে অলকার সোহাগ শচিনের বরাতে জুটবে না। যা হয়ে গেছে বিয়ের প্রথম চার বছরেই খতম। বাকি দশটা বছর ভিয়েতনামের যুদ্ধ। চলছে তো চলছেই। কবে যে শেষ হবে! সেই সাহেব শিকারীর কথা মনে পড়ছে। দূর থেকে বাঘের গায়ে পিন ছুঁড়ে মারেন। বাঘ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর বাঘের মত হিংস্র জন্তুকে বেড়ালের মত ন্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসেন। এই রকম একটা অস্ত্র যদি শচিনের থাকত! রোজ বাড়ি ঢোকার আগে জানালার বাইরে থেকে অলকাকে টিপ করে মারত! ব্যাস, বাঘিনী ঘুমে ন্যাতা। সংসার শান্ত। ডক্টর ঘোষ! ডক্টর ঘোষ কী করবেন! প্রেম! প্রেম নয়, শচিনকে হতে হবে শ্যামাদির স্বামীর মত!

অনেক ভেবে শচিনের মনে হল, একটা কাজ সে করতে পারে— চিড়িয়াখানা। অগতির গতি চিড়িয়াখানা। বাঘিনীকে বাঘ দেখাও, সিংহ দেখাও, আইসক্রিম খাওয়াও, ট্যাকসি চাপাও। সেই রেশে যদি কিছুদিন শান্তি পাওয়া যায়। আর দেরি নয় তাহলে। কালই। শুভস্য শীঘ্র। কাল অফিস না গিয়ে চিড়িয়াখানা। অনেক ছুটি পাওনা। ছুটি তো সে নেয়ই না। ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকলেই তো অশান্তি।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে শচিন শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

ঝনঝন করে বাসন পড়ার শব্দে শচিনের ঘুম ভেঙে গেল। বেশ বেলা হয়েছে। অলকা মেয়েকে বলছে, 'থাক, ডাকতে হবে না, আক্কেলটা দেখাই যাক না। কখন ওঠে, কখন বাজার হয়, কখন খাওয়া হয়, কখন আপিস যাওয়া হয়। আমার কী? আমি ভাত নামিয়ে বসে থাকি।'

শুভা বলছে, 'না মা, বাবাকে ডেকে দি। তা না হলে এমন তাড়াহুড়ো করবে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।'

'কোন দরকার নেই। আমি বাথরুমে ঢুকছি, তুই একটু পরে ভাতের হাঁড়িতে কেবল এক ঘটি জল ঢেলে দিস্।' শচিন বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। মরেছে, অলকা বাথরুমে ঢুকলে পাক্কা এক ঘণ্টা। তার আগেই মুখটা ধুতে হবে। শচিন ঘর থেকেই চিৎকার করে বলল, 'শুভা আমি উঠেছি।'

'উঠেছ বাবা!'

'হ্যাঁ মা উঠেছি।' শচিন বাইরে এল। আহা কী সুন্দর প্রভাত! চট করে মুখটা ধুয়ে আসি! 'অলকা, অলকা তুমি চা চাপাও।'

উঃ কতদিন পরে বউকে নাম ধরে ডাকা হল। দাঁতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে শচিন ভাবল, অলকা নামটা ভারী সুন্দর। অলকানন্দা। চেহারাতেও একসময় বিউটি ছিল। মনটা যদি একটু বিউটিফুল হত! কাদের বাড়ির রেডিও থেকে অতুলপ্রসাদের গান ভেসে আসছে, প্রভাতে যারে নন্দে পাখি।

হাত মুছতে মুছতে শচিন বেরিয়ে এল, 'কই চা হয়েছে অলকা?' কোনও দিকে না তাকিয়ে শচিন বসার ঘরের দিকে এগোল। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। অলকা, অলকা, একটু যেন তোয়াজের গলা। চায়ে চিনি গুলতে গুলতে মা মেয়েকে ফিস ফিস করে বললে, 'কী ব্যাপার!' মেয়ে ঠোঁট উলটে বোঝাতে চাইল, তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জান, আমি তো সবে এসেছি। জ্ঞান হয়েছে মাত্র কয়েক বছর।

শুভ চা নিয়ে এল। শচিন কাগজ দেখছিল।

'তোর মাকে ডাক তো।'

অলকা নববধূর মত পায়ে পায়ে বসার ঘরে এল। শাড়ির সামনেটা ভিজে। হাত মুছেছে। রাতের বাসি চুল, শরীর উস্ক খুস্ক। অনেকদিন পরে শচিন অলকাকে ভাল করে দেখছে। আগের অমন সুন্দর মুখটা সংসারের আঁচে যেন পোড়াপোড়া হয়ে গেছে।

'শোন আজ আর বেরোব না।'

অলকা উদাস গলায় বললে, ‘বেরিও না।’

‘কেন বেরোব না বল তো ?’

‘কী জানি ?’

‘আজ আমরা চিড়িয়াখানায় যাব। ডিম নিয়ে আসছি। ভাতে ভাত, ডিম সেদ্ধ, মাখন।

‘হঠাৎ চিড়িয়াখানায় ?’

‘অনেক ছুটি পাওনা, মাঝে মাঝে একটু আউটিং ভাল।’

‘তোমার ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপসান বুঝি !’

‘আরে না না। জীবনটা বড় একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। সংসার, অফিস, অফিস, সংসার।’

‘তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও।’

‘আর তুমি !’

‘আমার রোজ যা তাই। হাঁড়ি ঠেলা কাজ, সেই হাঁড়িই ঠেলে যাই সারাজীবন।’

‘এদিকে সরে এস।’

‘বল না।’

‘শচিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। অলকার চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে কাছে শুভা নেই।

শচিন অলকার গলাটা জড়িয়ে ধরে চুক করে গালে একটা চুমু খেল।

অলকা চমকে উঠেছে। ‘সাত সকালে এ কী অসভ্যতা।’

শচিনের নিজেকে মনে হল ইংরেজি ছবির হিরো। ডক্টর ঘোষ বলেছেন অ্যান্টাসিড নয়, চুমু। বেশ লাগল। অনেকদিন পরে যদিও ভয়ে ভয়ে আলগোছে।

‘যাও রেডি হয়ে নাও। তোমার চুল বড় তেলচিটে হয়েছে। একটু শ্যাম্পু করো।’ অলকা চলে গেল।

শচিন শুনতে পাচ্ছে মা মেয়েকে বলছে, ‘কীরে ভাতের তলা ধরে যায়নি তো মা।’

ওষুধ ধরেছে। মা বেরিয়েছে মুখ দিয়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। ডক্টর ঘোষ কী বলবেন ? তার নিজের লেখাপড়াও কম না

কি। নিজেই একটা মেন্টাল হসপিটাল খুলতে পারে। এই তো সেদিন এরিক ফ্রমের 'দি আর্ট অফ লাভিং'-এ পড়ছিল, লাভ ইজ অ্যান অ্যাকটিভ পাওয়ার ইন ম্যান, এ পাওয়ার হুইচ ব্রেকস থ্রু দি ওয়ালস···।

ছয়

সেই বলে না, সোনার মোহর মাটি চাপা থাকলে পেতলের মত ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়। একটু ঘষলেই আবার চকচকে। অলকার রূপটা আজ অ্যায়সা খোলতাই হয়েছে! কোথায় গেলেন শ্যামাদির স্বামী। আসুন একবার দেখে যান!

শুভা মায়ের হাত ধরে, শচিনের কাঁধে জলের বোতল। বাসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। না পেলে ট্যাক্সি। আজ আর কৃপণতা নয়। অলকা বললে, 'কিছু লজেনস কিনে নিলে হত।'

'ঠিক বলেছ।'

রাস্তার ওপরেই স্টেশনারি দোকান। শচিন বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। লক্ষ্যই করেনি বেগে একটা গাড়ি আসছে। রাস্তা পার হবার জন্যে একেবারে গাড়ির মুখোমুখি। অলকা একটান মেরে শচিনকে সরিয়ে আনল। গাড়িটা থামেনি। একটা গালাগাল ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেল। অলকার হ্যাঁচকা টানে শচিন প্রায় তার বুকের ওপর এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে জলের বোতল ছিটকে রাস্তায়। শুভা মা বলে চিৎকার করে উঠেছে। একটুর জন্যে শচিন বেঁচে গেল। অলকা হাঁফাচ্ছে। দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। অলকা কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'রাস্তা পার হবার সময় দেখবে তো। এখুনি একটা কাণ্ড হয়ে যেত।' অলকা কেঁপে উঠল। শুভা এসে শচিনের হাত ধরেছে, যেন হাত ধরে থাকলেই বাবা চিরকাল থাকবে।

অলকা বললে, 'চল ফিরে যাই। বাধা পড়ে গেছে! তোমার শরীর কাঁপছে।'

'ধুর ফিরব কেন? ফাঁড়া কেটে গেল।'

'তাহলে চিড়িয়াখানায় কাজ নেই। চল কালীঘাটে যাই। অনেকদিন ধরে মা টানছেন।'

কালীঘাট। শচিন একটু ঘাবড়ে গেল। ভিড় ঠেলাঠেলি, পাণ্ডা। মায়ের কথা উঠলে, না বলা যায় না। হিন্দুর ছেলে।

'বেশ তাই চল! বাসের চেষ্টা করে লাভ নেই। ট্যাকসি ধরি।'

'অনেক নিয়ে নেবে।'

'তা নিক, রোজগার তো খরচের জন্যেই।'

দুদিকের দু'জানালার ধারে মা আর মেয়ে মাঝখানে শচিন। বেশ লাগছে। সত্যিই বেশ লাগছে। হু হু করে গাড়ি ছুটছে। শুভার নানা প্রশ্ন। এটা কী ওটা কী? অলকা বললে, 'একদিন আমাকে নিউ মার্কেটটা দেখাবে?'

'আজই দেখিয়ে দোব ফেরার পথে।'

'একটা জিনিস কিনে দেবে?'

'কী?'

অলকা শচিনের কানে ফিসফিস করে সাধের জিনিসের নাম বললে, অন্য পাশ থেকে শুভা বললে, 'কী বাবা?' অলকা শচিনের উরুতে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলে।

শচিন বললে, 'তোর জন্য কাঁচের চুড়ি।'

শুভা খুব খুশি, 'তাহলে মাকেও কিছু কিনে দিও। তোমার জন্যেও কিছু কিনো।'

শচিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অখুশি মুখগুলো কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠেছে।

সাত

তেমন ভিড় নেই মন্দিরে। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মায়ের দিকে মুখ করে। পুজো নিচ্ছেন, প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁর কী মনে হল, অলকার কপালে গোল একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন। মুখে ঘামতেল কপালে

লাল টিপ। শচিনের মনে হল কুসুমডিঙ্গার দিন হোমের আগুনে অলকার মুখটা এইরকম দেখতে হয়েছিল। তখন শচীনের সঙ্গে বাঁধা ছিল গাঁটছড়া। অতীত যেন ফিরে এসেছে বর্তমানে। কান পাতলে কি সানাইয়ের সুর শোনা যাবে?

অলকার চোখে জল। শচিনের মনে হল পাথরে জল ঝরছে।

'তুমি কাঁদছ কেন?'

'আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে, আমি মরতে বড় ভয় পাই।'

'মরার কথা আসছে কেন?

'আসছে। তোমাকে আমি বলিনি। আমার ভীষণ একটা অসুখ করেছে।'

'কী অসুখ?'

'টিউমার।'

'টিউমার? কোথায় টিউমার?'

'এই যে মাথার মাঝখানে।'

অলকা মাথাটা নিচু করল। কপালের সামনে থেকে চুল দুভাগ করে সিঁথি চলে গেছে মাথার মাঝখান পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে খোঁপা টলমল করছে। শচিন মাথার মাঝখানে হাত দিয়ে দেখল গোল মত একটা কি উঁচু হয়ে উঠেছে। গুলির মত হাতে চাপ দিলে পিছলে এপাশ ওপাশ করছে।

'তুমি বলনি তো।'

'কী বলব, বলে কী হবে? তোমাকে না বলে একদিন ডাক্তার-বাবুকে দেখিয়েছিলাম। বললেন, 'জায়গাটা খারাপ। ভাল করে দেখতে হবে।'

অন্য দর্শনার্থীদের ঠেলা খেয়ে তিনজনকে সরে আসতে হল। একপাশের চাতালে বসে শচিন জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়?'

'যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে মাথাটা মনে হয় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চোখেও যেন কম দেখছি আজকাল। কান দুটোও কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশি দিন বাঁচব না গো। তোমাকে অনেকদিন জ্বালিয়েছি, এইবার তোমার ছুটি। আবার যদি বিয়ে কর, একটু দেখে শুনে কোরো, শুভাটাকে যেন যত্ন করে।'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শুভা ফ্যাস-ফোঁস করে উঠল। শচিন চুপ। ভেতরটা বড় নাড়া খেয়েছে।

রাত নিঝুম। শচিন মেটিরিয়া মেডিকা খুলে বসেছে। টিউমার, টিউমার। কত পাতায়। হোমিওপ্যাথিতে টিউমার সারে। বইয়ের ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরোল। অনেকদিন আগে খবরের কাগজে দেবে বলে রাগ করে একটা বিজ্ঞাপন লিখেছিল।

স্বামী চাই

মধ্যবয়সী বিবাহিতা মহিলার জন্য পার্টটাইম স্বামী চাই।

দুপুরে বিকেলে প্রেম করতে হবে, তোয়াজ করতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সব খরচ আসল স্বামীর। এমন কি অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায়িত্ব। লিখুন বকস নং…

শচিন কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিল। অন্ধকারে সাদা সাদা কাগজের টুকরো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ছে। আলো পড়ে কোনওটা চিকচিক করছে। যেন অজস্র বাদুলে পোকা।

দেওয়ালের ব্র্যাকেটে মা কালীর সিঁদুর মাখা ছবি। মায়ের পায়ের তলায় কালীঘাট থেকে আনা প্রসাদী জবা ফুল জিভের মত লকলক করছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। শচিন একা জেগে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তোমার সংহারের রূপ আমি আর দেখতে চাই না।

অনেক অনেক দিন আগে শচিন একটা গল্প পড়েছিল 'স্রোতের ফুল'। সেই গল্পের সঙ্গে একটা ছবিও ছিল। নির্জন নদীর ঘাটে একটি বালিকা একের পর এক জলে ফুল ভাসিয়ে চলেছে। গল্পটা তার এখনও মনে আছে। অনেকে বলেন, ঈশ্বর এক মহান শিশু, বসে আছেন বিরাট সিন্ধুর তীরে আপন মনে। একটি একটি করে জীবনের ফুল ভাসিয়ে চলেছেন। ভাসতে ভাসতে সুদূরে চলেছে, কখনও একটি, কখনও পাশাপাশি দুটি তিনটি। এইভাবে চলতে চলতে স্রোতের টানে আবার একা। মিলন, বিচ্ছেদ, সঙ্গ, নিঃসঙ্গ সবই স্রোতের খেলা। অলকার জন্যে অসম্ভব করুণায় শচিনের মনটা কানায় কানায় ভরে গেল। একটা জীবন এসেছিল আর

একটা জীবনের সঙ্গে মিলতে। একটু স্নেহ ভালবাসা, একটু নির্ভরতা, এ আর এমন কী ধন-দৌলত যা দেওয়া যায় না। কী তুচ্ছ ভাত, ডাল, তরকারির স্বাদ বিস্বাদ নিয়ে কলহ! কীসেরই বা অহঙ্কার!

বই বন্ধ করে শচিন বিছানায় গেল। অলকার ব্রহ্মতালুর ফুলো জায়গায় একটা আঙুল রাখল। অলকা খুব ঘুমোচ্ছে। বাইরে তো বেরোয় না, ঘোরাঘুরিতে খুবই ক্লান্ত। অলকা ঘুমোলেও টিউমারটা ঠিকই জেগে আছে। দেওয়াল ঘড়ির টিকটিকের সঙ্গে সমান তালে দপ দপ করে চলেছে। আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি। কী বলতে চাও? তোয়াজে সারতেও পারি আবার মরতেও পারি।

দিন আনি দিন খাই

জলটল খেয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি। আজকের কাগজটায় একবার চোখ বুলবো, তারপর দাঁত বের করা কাপে তিনের চার কাপ চা খেয়ে মুখটাকে টক করে দোকান খুলব। অফিসকে আমরা এক এক সময় এক এক আদুরে নামে ডাকি। কখনও দোকান বলি, কখনও মামার বাড়ি বলি, কখনও ক্লাব বলি। সরকারী অফিসে মার্চেন্ট অফিসের মত বাঁধাবাঁধি অত থাকে না। একটু ঢিলেঢালা ভাব। কেউ কারুর দাস নই। আমরা সবাই দেশসেবক। দেশ জননীর সেবা করতে এসেছি। মাসের শেষে সামান্য দক্ষিণায় কায়ক্লেশে সংসার চলে। কাজের জবাবদিহি বড় কর্তার কাছে নয়, দেশের মানুষের কাছে। যাঁরা আমাদের নিন্দে করেন, অপদার্থ ঘুসখোর বলেন, তাঁদের আমরা তেমন পাত্তাটাত্তা দিই না। জনসেবায় অমন দু'চার কথা সহ্য করতেই হয়। চামড়া একটু পুরু না করলে দেশসেবা করা যায় না। মনের আস্তরণে একটু গণ্ডার ভাব আনতে হয়। রাইনোসেরাস না হলে পাবলিক সারভেন্ট হওয়া যায় না। যে যাই বলুক, গুন গুন করে গেয়ে যাও কিশোরকুমারের সেই বিখ্যাত গান—

কুছ তো লোগ কহেঙ্গে
লোগোঁ কা কাম হ্যায় কহনা
ছোড়ো বেকার কি বাতোঁমে।

যে দাদাকে ধরে চাকরিটা পেয়েছিলুম, তিনি প্রায়ই বলতেন, দেশসেবা বড় 'থ্যাঙ্কলেস জব' হে। আমরা সবাই যীশুখ্রীস্ট! কাঁটার মুকুট মাথায় চাপিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ত্যাগ, ত্যাগ। আমাকে অবশ্য মই ঘাড়ে করে পোস্টার-ফোস্টার মারতে হয়নি। আমার কাজ ছিল লেখা। উনুনের যেমন কয়লা চাই, নেতাদের তেমনি অক্ষর চাই। রাশি রাশি অক্ষর। একের পেছনে আরেক, মাইলের পর মাইল। নেচে নেচে বেরোবে। গরম গরম, নরম নরম, আবেগে তুলতুলে, রাগে গমগমে, বিদ্রুপে কষকষে। পলিটিক্যাল বক্তৃতা আর বিয়ে বাড়ির ছ্যাঁচড়া এক জিনিস। নৃ-তত্ত্ব ভূ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অ্যানাটমি, ভ্যাসেকটমি, সব এক কড়ায় ফেলে, লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রগরগে করে পাতে ফেলে দাও। গভীর জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই। এ লাইনে জ্ঞান হল ডিসকোয়ালিফিকেসান। পিঠে সুড়সুড়ি দেবার জন্য সার্জেনকে ডাকার প্রয়োজন হয় না। বাঁদরেও দিতে পারে। পারে না, ভালই দেয়। ভাসা ভাসা জ্ঞানের ফুলঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে দাও। নরুণ দিয়ে ছানি অপারেশান।

ওই কর্মটি আমি ভালই পারি। 'বন্ধুগণ' বলে একবার শুরু করলে আণবিক বোমা পর্যন্ত আমার পথ পরিষ্কার। কীর্তনীয়ার সখীগো-র মত। এক টানেই ভক্তদের হৃদয় ফর্দাফাই। তা দাদা খুশি হয়ে, প্রচার দপ্তরে এই চেয়ারটি আমার পাকা করে দিলেন। ঢুকেছিলুম তলায়, মুখের জোরে ধীরে ধীরে ঠেলে উঠছি ওপর দিকে। আমার দাদা কবে ডিগবাজি খেয়ে সরে পড়েছেন। এই খেলায় যা হয় আর কি। সাপলুডোর মত। এক চালে জনপ্রিয়তার সাপের মুখ গলে একেবারে ন্যাজে। আবার কোন চালে মই পাবেন কে জানে। যীশু এখন শিশুর মত হামা টানছেন। সাবালক হতে সময় লাগবে। দলফল ভেঙে চুরমার। বাজারে অনেক আঠা বেরিয়েছে। মানুষের মাথা, ভাঙা দল কিম্বা টুকরো দিল জোড়ার আঠা এখনও বেরোয়নি।

এই অফিসে ঢুকে একটা গূঢ় তথ্য আমি জেনে ফেলেছি যা বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে থাকলে জানা যেত না। এদেশ

থেকে সায়েব এখনও যায়নি। সাদা চামড়া চলে গেছে, সায়েব কিন্তু পড়ে আছে। লাহিড়ী সায়েব, দাস সায়েব, বোস সায়েব, মিত্তির সায়েব। সায়েবদের কী সব চেহারা। গেজেটেড হলেই সায়েব। আগে পাড়ার গিন্নিবান্নি মহিলাকে গেজেট বলা হোত। তাঁর কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি হাঁড়ির খবর জোগাড় করে দুপুরে মহিলামহলে পেশ করা। এ গেজেট অবশ্য সে গেজেট নয়। বিশাল একটা মোটা বই। সেই কেতাবে যাঁর নাম, তিনিই সায়েব। সেখানেও স্তর আছে। ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু। অনেকটা সেই ট্যাঁস ট্যাঁস ফিরিঙ্গির মত। মাইনে কারুরই খুব বেশি নয়। তবে দাপট আছে। দেশের সব কিছুই তো এঁদের হাতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি-সংস্কার, কৃষি, শিল্প। ফাইল নাড়ানো প্রভুর দল। মাথা নাড়া বুড়োর মত অথবা বুড়ো শিবের মত। নামকাটা সেপাই নয়। গেজেটেড সেপাই। নিজেদের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখেন। ঢলঢলে প্যান্ট। মাঝে মাঝেই টেনে তুলতে হয় কোমরের দিকে। হাওয়াই শার্ট। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। কুঁচকে মুচকে ব্যক্তিত্বশূন্য, লতপতে একটা ব্যাপার। অনেকে আবার নস্যি নেন। স্নাফ ইওর নোজ অ্যান্ড স্নিফ এ ডিসিসান। গেজেটেড হলে টেবিলে একটা মাঝারি মাপের কাচ পাবার অধিকার জন্মায়, চায়ের চরণ-চিহ্নিত টেবিলে কাচ, কাচের তলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, মা কালী, স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ। স্টোর থেকে একটি তোয়ালে পাওনা হয় সায়েবদের। কোট ঝোলাবার হুক-দম্পতি সমেত একটি আয়না, একটি বৈদ্যুতিক ঘন্টা, টেলিফোনের একটি একসটেনশান লাইন, বিমর্ষ চেহারার একটি দেয়াল ক্যালেন্ডার, সামনে একটি ডেস্ক ক্যালেন্ডার, কলঙ্কিত অ্যাসট্রে, গোটাকতক মুশকো চেহারার পেপারওয়েট, কলমদান প্রভৃতি নিয়ে সায়েব বসেন ক্ষমতার টাটে। দু'পাশে জমতে থাকে পাহাড়ের মত ফাইলের স্তূপ। হরেক রকমের বায়না। জন-সাধারণের জীবন যন্ত্রণা অষ্টপ্রহর কেঁদে চলেছে, সায়েব আমাকে দ্যাখো। জল নেই, কল নেই, জমি নেই, লোহা নেই, সিমেন্ট নেই, পথ নেই, আলো নেই। ফাইল নিচে থেকে ওপরে ওঠে। সায়েবের

কাজ 'অ্যাজ প্রোপোজড' বলে সই মারা। নিচে যিনি আছেন, তিনি লেখেন 'পুট আপ ফর পেরুজ্যাল অ্যান্ড নেসাসারি অ্যাকসান।' তারপর 'অ্যাজ প্রোপোজড' হতে হতে 'ওঁ গঙ্গায় নমঃ', গ্যাঞ্জেস ডিসপোজাল। মানকুণ্ডুর মানসবাবু, বর্ধমানের বরোদাবাবু ক্যানিংয়ের কালোবাবু জেলা অফিসে যাচ্ছেন আর আসছেন, রোজই শুনছেন ফাইল ওপরে গেছে। 'অ্যাজ প্রোপোজড'। কেউ উল্টে দেখেনি প্রোপোজালটা কী। পেঁয়াজের খোসার মত প্রেপোজালের খোসা ছাড়ালে কিছুই আর মেলে না। ব্রহ্মের স্বরূপের মত। ওদিকে যাঁর আর্জি তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উত্তর পুরুষ শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে থাকেন। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং, অর্থাৎ স্তম্ভে স্তম্ভে মাথা ঠুকে তিনি এখন ব্রহ্মে। বিবেকবান দেশসেবক দেশবাসীদের যেমন উপদেশ দেন, দেখবেন মানুষ যেন কাজ পায়, 'ফ্রম পিলার টু পোস্ট, পোস্ট টু পিলার,' এই বদনাম ঘোচাতে হবে, সব রেডটেপ খুলে নিজেদের প্যান্টের তলায় ঘুনসি করে নিন। গুনগুনিয়ে আবার সেই গান ঃ কুচ্ লোগ কহেঙ্গে। লোগোঁ কা কাম হ্যয় কহনা। সায়েব নস্যি নিতে নিতে জেলার নেতাকে বললেন, সব কিছুর একটা প্রোসিডিওর আছে। কালভার্ট কালভার্ট করছেন, স্যাংসন কোথায় ? কোন স্কীমে হবে ? এখন যেমন সাঁতরে খাল পেরোচ্ছেন পেরিয়ে যান। ফিনান্সে প্রেপোজাল গেছে। ফিনান্স থেকে সি. এম ; সি. এম থেকে ক্যাবিনেট, ক্যাবিনেট থেকে সি. এম ; সি. এম থেকে ফিনান্স ; ফিনানস্ থেকে পি ডব্লু ডি ; পি ডব্লু ডি থেকে লোকাল সেলফ্ গভর্নমেন্ট ; সেখান থেকে অঞ্চল ; অঞ্চল থেকে পঞ্চায়েত। ইজ ইট সো সিম্পল ? নিন এক টিপ নস্যি নিন। তবে হ্যাঁ মিনিস্ট্রি যদি উলটে যায়, কান্ট হেল্প, তখন প্রেসিডেন্টস রুল, মানে গভর্নর, গভর্নর হয়তো বলবেন, একটু অপেক্ষা করুন, নির্বাচন তো হবেই, নতুন ক্যাবিনেট ডিসিসান নেবে! ক্যাবিনেট, কফিন, কেবিন সব যেন সমার্থক শব্দ। কখন কি ভূত বের করে কে জানে।

অফিসে আমার নিজের পয়সায় কেনা একটা কেটলি আছে।

সেটার চেহারা তেমন ভাল না হলেও কাজ চলে যায়। গোটাকতক ভাঙা কাপ আছে। আর আছে আমার পিওন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো অমূল্য। অমূল্যের প্রথম বউ তিনটি সন্তান উপহার দিয়ে ক্ষয়কাশে ভুগে ভুগে সরে পড়েছে। অমূল্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। সাহস আছে। যা মাইনে পায় তাতে নিজেরই চলে না। দ্বিতীয় পক্ষ চটজলদি দুটি প্রাণ নামিয়ে দিয়েছে। অমূল্য এখন পাঁচে পঞ্চবাণ। এ অফিসের নিয়ম হল কেউ কারুর কথা শুনবে না। যার যা কাজ, তিনি যদি সেই কাজ ভুলেও করে ফেলেন, তার চেয়ে অপরাধ আর কিছু নেই। কর্মচারীদের দু'টো ইউনিয়ন। দু'রকম রাজনৈতিক রঙ। মঞ্চে ফোকাস মারছে। অভিনেতারা হাত পা ছুঁড়ছে। গদিতে যখন যে দল তখন সেই সেই ইউনিয়নের প্রবল পরাক্রম। অমূল্যর বয়েস হয়েছে, পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়ে, তাই একটু মান্য করে চলে। কথাবার্তা শোনে। বারে বারে চা আনে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে দেয়, পোস্টাপিসে লাইন দিয়ে খাম পোস্টকার্ড এনে দেয়। টিফিন এনে দেয়, ভাগ পায়।

অমূল্য আজ গেঞ্জি পরে এসেছে। নীল জামাটা কাল বড় ছেলে বেচে দিয়ে চায়নাটাউনে শাম্মীকাপুরের নাচ দেখেছে। বার বার দেখো, হাজার বার দেখো। কাল রবিবার ছিলো। এর আগে ছেঁড়া ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল অমূল্যর, সেটা ঝেড়ে জুয়া খেলেছিল। ছাতা, জুতো বাসন কোসন সবই এইভাবে গেছে। অমূল্যের ভয় কোনও দিন ঘুমের সময় পরনের কাপড়টা খুলে নিয়ে বেচে না দেয়!

অমূল্য ফুটপাতের দোকান থেকে চা এনেছে। সহকর্মী বিমলও এসেছে। সাধারণত বারোটায় আসে, আজ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে সকাল সকাল চা এসেছে। বিমল আবার শিল্পী। গান লেখে, গান গায়। নতুন একটা গান লিখেছে। টেবিলে তাল দিতে দিতে গানে সুর চড়াচ্ছিল, এক তারা, দু তারা, তারা তিন চার। তা ধিন্ ধিন্ তা, তারা তিন চার, তোমার কথাই কেন, ভাবি বার বার।

গান শুনতে শুনতে সবে সিকি কাপ চা খাওয়া হয়েছে, এমন

সময় ব্যানার্জিসায়েব ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকলেন। ইনি হলেন এক নম্বর সাহেব। লম্বা চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট। কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সুনাম আছে। জীবনে কারুর ভাল করেন নি। সুযোগ পেলেই সহকর্মীদের বাঁশ দেন। প্রমোশান আটকে দেন। এমন সব ব্যবস্থা নেন যাতে ঘন ঘন মোশান আছে। এর তূণে মারাত্মক দুটি অস্ত্র আছে, সাসপেনসান অ্যান্ড ট্রানসফার। তৈল মর্দনে ভারী ওস্তাদ। আমরা নাম রেখেছি তেলসাহেব।

সাহেব এলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে হয়। সার্ভিস কনডাকট রুলে কী আছে জানি না, তবে একটাই নিয়ম। বড় এলেই ছোট উঠে দাঁড়াবে। পুলিসদের সার্ভিস কনডাক্ট রুল পড়ে আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন, বসুন।

বিমলের উঠে দাঁড়াতে একটু দেরি হচ্ছিল। টেবিলে হাঁটু তুলে গাড়ু হয়ে বসেছিল। পেছন দিকে শরীর ঠেলে, হাঁটু নামিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। কে জানত ব্যানার্জিসায়েব এসে পড়বেন! চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে পা আটকে বিপর্যয় কাণ্ড। ব্যাগ থেকে আনারস বের করার মত অবস্থা। যাক ওঠার আগেই বসার হুকুম পেয়ে বেচারা বেঁচে গেল। ব্যানার্জি সাহেব তির্যকে বিমলকে একবার দেখে নিলেন। হয়ে গেল তোমার। ট্রানসফার টু কুচবিহার।

ব্যানার্জিসাহেব কোনও রকমে সামনের চেয়ারে পেছন ঠেকালেন। চাকরির খাতিরে মানুষকে কত যে নিচে নামতে হয়। কুলীনকুলসর্বস্ব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মানে বড় পদ, তাঁকে বসাতে হল আমার মত এক হরিজনের সামনে। ছোট পদ মানেই হরিজন।

ব্যানার্জিসায়েবের মুখ বেজায় গম্ভীর। হাসেন, তবে আমাদের সামনে নয়। হাসলে পার্সোন্যালিটি লিক করবে। ভোরে টিনের চালে বসে কাক যে সুরে ডাকে সেই সুরে ব্যানার্জিসায়েব বললেন, দুর্গাপুজো সম্পর্কে কোন আইডিয়া আছে!

দুর্গাপুজো? কী রকম আইডিয়া স্যার? মানে সার্বজনীন পুজো! প্রত্যেক বছর চাঁদা দি স্যার! দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাই।

ওইতেই হবে, ওইতেই হবে। একটা বক্তৃতা লিখতে হবে। দুর্গা-পুজোর সঙ্গে একটু স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি পাঞ্চ করে দেবেন। বেশি বড় করার দরকার নেই। পাঁচ দশ মিনিটের মত হলেই হবে, বেশ জমিয়ে লিখবেন। মনে রাখবেন মন্ত্রীর বক্তৃতা। যদি একচান্সে মনে ধরাতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে উঠে যাবেন। চরচর প্রমোশান। আর যদি জিনিসটা না জমে, ট্রানসফার্ড টু কুচবিহার।

বলছেন?

ইয়েস। দেবতা প্রসন্ন হলে মানুষের কী না হয়।

মিত্তির সাহেব আর বাগড়া দিতে পারবেন না!

কারুর বাপের ক্ষমতা নেই বাগড়া দেয়। মন্ত্রী সো ডিজায়ার্স।

কখন দিচ্ছেন লেখাটা?

কালকে।

আরে না না, কাল উইল বি টু লেট। বেলা তিনটে নাগাদ আসব। অ্যাসেমব্লিতে টুক করে মন্ত্রীকে ধরিয়ে দিয়ে যাব। ব্যানার্জিসাহেব চলে গেলেন। বিমল বললে, দুর্গাপুজোয় ইন্ডাস্ট্রি ঢোকাবি কী করে?

দ্যাখ না ঠিক ঢুকিয়ে দেব। মহাভারতে অত মাল ঢুকতে পারে, পুজোয় স্মল স্কেল ঢুকতে পারে না!

বন্ধুগণ!

ওই দেখুন দুর্গা দশভুজা। সিংহবাহিনী, অসুরদলনী।

আমরা, এই আমরা, যারা আজ ক্ষমতার আসনে বসে আছি, তারাও দশভুজা অসুর দলনকারী।

দেশে আইন শৃঙ্খলাহীন যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছিল আমরা সেই আসুরিক শক্তিকে শক্ত হাতে দাবিয়ে রেখে ধীরে ধীরে জন-জীবনে শান্তির শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মধুবাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

বিমলকে গৌরচন্দ্রিকাটা পড়ে শোনালুম। চারটে লাইন একেবারে ফর্মুলায় ফেলা। সমস্ত পুজোর আগে যেমন গণেশ পুজো, একদন্তং মহাকায়াং লম্বোদর গজাননং, সেই রকম যারা ছিল তারা বদ, আমরা যারা এসেছি, তারা গণেশের মতোই,

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং, নিজেরাই নিজেদের প্রণাম করি। জনগণেশের সেবক আমরা। একেবারে কড়া নির্দেশ. মন্ত্রীর ভাষণের শুরুতেই পূর্বতন সরকারকে দু ছত্র চপেটাঘাত অবশ্যই করতে হবে। মা দুর্গার দশহাতের সঙ্গে মালটা কায়দা করে লাগিয়ে দিয়েছি। এইবার বাকিটা দুর্গা বলে নামিয়ে দিতে পারলেই ল্যাঠা শেষ।

বন্ধুগণ. আমাদের এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবী সমাদরে পুজো পান না। খুবই দুঃখের কথা। আমরা যদি গদিতে পাকাপোক্ত-ভাবে বসতে পারি. তাহলে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত ভাবে জনজীবনকে উৎসবে উৎসবে ভরিয়ে তুলব। এক যায় তো আর এক আসে। প্যান্ডেল আর খুলতেই হবে না। আলোর ঝালর বারোমাস ঝুলতেই থাকবে। মাইক গানে গানে আকাশ বাতাস অষ্টপ্রহর উদ্বেল করে রাখবে। যেও না নবমী নিশি লয়ে তারাদলে, কবির এই আক্ষেপ আর থাকবে না। আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সব নিশিকেই অমাবস্যা নিশি করে তুলেছিলেন. আমরা আজ কৃতসঙ্কল্প. বন্ধুগণ, সুযোগ দিন. আপনাদের জীবনে নবমীর রাতকে আমরা চিরস্থায়ী করে ছেড়ে দোব। আপনারা আমাদের পাকা করুন, আমরাও আপনাদের পাখার বাতাস করব।

পুজো যত বাড়বে দেশের মানুষের অবস্থাও তত ভাল হবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসবে অকৃপণ ধারায়। বসুন্ধরা সুজলা সুফলা হবে। খরা থাকবে না, বন্যা আসবে না। শরতের শস্যক্ষেত্রে বাতাস নেচে যাবে বাতুলের আনন্দে। পুজো মানেই শিল্প। পুজো অর্থনীতিকে ঠেলা মারে, চাঙ্গা করে তোলে। কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি তাল তাল এঁটেল মাটি ডাঁই করে। চ্যাঁচারি, দরমা, খড়, পাট, দড়ি, শোলা, জরি, সলমা, চুমকি, সাটিন কাঁচামাল আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। সপরিবারে শিল্পী আটচালায় বসে পড়েন প্রতিমা গড়ার কাজে। বাবুরা আসতে থাকেন বায়নার টাকা নিয়ে। দুর্গাপুজোই সবচেয়ে বড় পুজো। একঢিলে ছ' পাখি। মা দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অসুর। জীব-জন্তুর মধ্যে সিংহ, প্যাঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর। মা দুর্গাকে

সপরিবারে সাপ্লাই দিতে হয়। সবই ম্যাগনাম সাইজের। প্রচুর বাঁখারি, বিচুলি, পাট, মাটি, তুষ, কাপড় রঙ লাগে। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই যাঁরা মায়ের একান্নবর্তী পরিবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন। পরোক্ষে তাঁরা বাংলার দরিদ্র শিল্পী পরিবারকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। একেই বলে কারুর সর্বনাশ কারুর পৌষ মাস।

বন্ধুগণ, আপনাদের গলায় গামছা দিয়ে যারা চাঁদা নিয়ে যান, তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। ভক্তের ভক্তিপুজো নাই বা হল। সবাই কি আর রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ। পাড়ায় পাড়ায় হুল্লোড়ের পুজোই হোক। এক কমিটি ভেঙে শত কমিটি হোক। শিল্প বাঁচুক, শিল্পী বাঁচুক। আমরা যদি সুপরিকল্পিতভাবে আরও কিছু দেবীকে জাতে তুলতে পারি, তা হলে কুমোরপাড়া সারা বছরই রমরমে হয়ে থাকবে, কাপড় জামার দোকানে সারা বছরই পুজো লেগে থাকবে। প্যান্ডেলওলাদের প্যান্ডেল আর খুলতে হবে না। এক যাবেন, আর এক আসবেন। তাসাপার্টি ন্যাশন্যাল অর্কেস্ট্রার চেহারা নেবে।

বন্ধুগণ, এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে হাসি ফুটবে। মা হাসবেন, ছেলে হাসবে। বছরে একবার চাঁদা দিতে গায়ে লাগে। দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেলে, ইনকাম ট্যাকস, সেলট্যাকসের মত সহজ হয়ে যাবে। মনে তখন আর কোন বাধা থাকবে না। তৈয়ার বলে, গেরস্থ হাসি হাসি মুখে, আপ্যায়ণের ভঙ্গিতে চাঁদা তুলে দেবে।

বন্ধুগণ, এ চাঁদা চাঁদা নয়, পরভর্তিকা। চাঁদা নয়, বলুন পারকোলেশান অফ ওয়েলথ। চাঁদা নয়, বলুন সাম্য। আমাদের সংবিধান যে সাম্য, মৈত্রী আর একতার কথা বলেছেন, তা রাজনীতি দিতে পারবে না। রাজনীতি কোনও নীতিই নয়, একধরনের ছ্যাঁচড়ামি। বারোয়ারীই হল সমস্যা সমাধানের পথ। চাঁদায় প্রতিপালিত হবে শিল্পী, চাঁদায় প্রতিপালিত হবে বেকার। আমরা আর কতজনকে চাকরি দিতে পারব! বেকারদের ফেলে দিন মায়ের চরণে, বাবার চরণে! বাছারা বেঁচেবত্তে থাক। তাদের বাঁচা দরকার। তা না হলে নির্বাচনে লড়বে কারা, দেয়ালে দামড়া অক্ষরে

জাতিকে জাগরণের বাণী শোনাবে কারা! জয় হিন্দ।

না, জয় হিন্দ এখানে চলবে না। রেডিও কি টিভির ভাষণে চলে। পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে বেমানান। কেটে উড়িয়ে দিলুম।

বিমল শুনে বললে, একটু যেন ফাজলামো হয়ে গেল রে। মিনিস্টার না রেগে যান। রেগে গেলে তোর চাকরি যাবে মাইরি!

একটু প্যাঁচ কষে দিলুম। কেন বলুন তো?

নিজের ওপর নিজে প্যাঁচ কষলি! কালিদাসের টেকনিক? যে ডালে বসে আছিস সেই ডালটা কেটে ফেলার প্যাঁচ?

আজ্ঞে না স্যার। ব্যানার্জিসাহেবের বাঁশ তৈরি হল। হাতে করে নিয়ে যাবেন, পেছনে করে ফিরে আসবেন। এই মাল আমাকে গত বছর বাঁশ দিয়েছিল, মনে আছে?

তোর সেই প্রোমোশান?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্টারভিউতে যত জামাই ঠকানো প্রশ্ন করে আমাকে আউট করে দিয়ে নিজের শালাকে ঠেলে তুলে দিল। সে মালকে তো চিনিস। একেবারে নীলকণ্ঠ। পাপ করে করে পাকতেড়ে মেরে গেছে।

বিমল ফিস্ ফিস্ করে মুখে শব্দ করল। ব্যানার্জিসাহেব আসছেন।

কী, হয়ে গেছে?

এমনভাবে বললেন, যেন আমি মালের বাপের চাকর। মাল শব্দটা আমি বিমলের কাছে শিখেছি।

হ্যাঁ স্যার।

দিন দিন। বড় হয়ে গেল না কি? ক মিনিট?

চার-পাঁচ মিনিট হবে।

দেন ইট ইজ অলরাইট। প্রাইভেট সেক্রেটারি এর মধ্যে বার-তিনেক ফোন করেছেন। এত জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, বক্তৃতা লেখার একটা যন্ত্র বেরোলে বেশ হত। কল টিপে জল বের করার মত! দরকার মত একমিটার, দুমিটার বক্তৃতা বের করে নেওয়া যেত।

বিমল বললে কাজটা কি ভাল হল? কে লিখেছে বলে, সেই

দুর্বাসা যখন চিৎকার করবে, তখন তো মাল তোমাকে নিয়ে টানাটানি হবে।

তুইও যেমন, মালকে চেন না, হেসে হেসে বলবে, এই যে স্যার লিখে নিয়ে এসেছি। ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। পুজোর সঙ্গে ইন্‌ডাস্ট্রি। আপনার মাথাতেও আসে স্যার।

বিমল মন্ত্রীর গলা নকল করে বললে, এইরকম মাথা বলেই আপনাদের মত গাধাদের সামলাতে পারছি।

আমি ব্যানার্জিসাহেবের গলায় বললুম, হেঁ হেঁ তা যা বলেছেন স্যার। আমাদের গাধা বললে, গাধারাও স্যার প্রতিবাদ করবে।

বিমল বললে, থাক, নিজেদের চিনতে পেরেছেন দেশের মানুষের সৌভাগ্য। এক তারা দু'তারা, তারা তিন চার।

বিমল আবার গান ধরল, টেবিলকে তবলা করে। তিন তালে বেশ কিছুক্ষণ কালোয়াতি চলল। অফিস না পাড়ার ক্লাব, এ প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লগল। দু'চারজন পাবলিক খবরা-খবর সংগ্রহে এলেন। শিল্পের খবর। কী করলে, কী হয়। দেশে চাকরি নেই। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই তো ঝুঁকতে হবে।

একজনকে বলা হল, ইট তৈরি করুন। গঙ্গায় ভীষণ পলি পড়েছে। কাটুন আর ছাঁচে ফেলে ইট বানান। সভ্যতার ফাউন্ডেশানই হল ইট। নাক সেঁটকাবেন না। ইট শুনতে খারাপ লাগলে বলুন বিলডিং ব্লকস। মানুষের যেমন আদি মানব আছে, শিল্পেরও তেমনি আদি শিল্প আছে। ইট সেইরকম একটি জিনিস। ইটের মার নেই। পচবে না, গলবে না। থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান ব্যবহার। বাড়ি তৈরিতে লাগবে প্লাস মানুষ যত রাজনীতি সচেতন হবে ইটের ব্যবহারও তত বাড়বে। ইটের নাম তখন ব্রিকব্যাটস। ভেঙে টুকরো করে সাপ্লাই দিন। অপোনেন্টকে ঘায়েল করার এর চেয়ে ভাল দিশি গোলা আর কী আছে!

আর একজনকে বলা হয় পাঁপর তৈরি করুন। বাংলার ঘরে ঘরে পাঁপরশিল্প চালু হোক। এটা আমাদের সাম্প্রতিক মস্তিষ্ক-তরঙ্গ। কর্তৃপক্ষ ভেবেচিন্তে বের করেছেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা

বেকার। চুল বাঁধছেন আর চুলোচুলি করছেন। মেয়েদের একবার পাঁপরশিল্পে জুড়ে দিতে পারলে, পাড়া জুড়াবে, বর্গী আসবে। বর্গী নয় নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক কানে আসতে থাকবে। পাঁপরের ওপর প্রায় চল্লিশ পাতার একটা রিপোর্ট, সাইক্লোস্টাইল করে, হলদে মলাট দিয়ে বেঁধে মন্ত্রীর টেবিলে দেওয়া হয়েছে। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

TOTAL EMPLOYMENT AND PAPAD

সাতটা অধ্যায়। অতীত বাংলা, বর্তমান বাংলা, ইতিহাসে পাঁপর, ডালের উৎপাদন, গুদাম ও পোকা খাওয়া ডাল, জল ও লোহাজল বাঙালীর আহার-বৈচিত্র্য, পাঁপর ও পার্ক, পেট ও পাঁপর, অ্যালকহল ও পাঁপর, অবাঙালী সম্প্রদায় ও পাঁপর ; তেলেভাজা পাঁপর ও সেঁকা পাঁপর, বিবাহ ও লোকাচারে পাঁপর, হজম-বদহজম ও পাঁপর, বর্ষা ও পাঁপর। সাতটি অধ্যায় জুড়ে পাঁপরের শ্রাদ্ধ, শান্তি তিলকাঞ্চন।

ভদ্রলোক বললেন, কী যে রসিকতা করেন মাইরি। পাঁপর আবার একটা শিল্প!

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, কুটির শিল্প।

বিমল বললে, পেঁয়াজিটাও একটা শিল্প।

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। যা আপনারা দিন রাত বছরের পর বছর করছেন।

দুই

সেদিন বেলা তিনটে হবে, পুজোর দীর্ঘ ছুটির পর অফিস সব খুলেছে, বসে বসে একটু স্টিম নিচ্ছি, কাজে মন বসাতে আরো দিন পনের সময় লাগবে, ততদিনে কালীপুজো এসে যাবে। কালী পুজো, ভাই ফোঁটা মিলিয়ে আবার দু'দিন ছুটি। পুজোর ছুটিতে মধুপুর মেরে এসেছি। কালীপুজোয় দীঘা যাব, ক্যালেন্ডার দেখছি। এক দিন ক্যাজুয়েল নিলে পর পর তিন দিন হয়ে যাবে।

সবে মধুপুর থেকে এসেছি। ছুটির ঘোর এখনও কাটেনি। বেলা পড়ে এলেই মনে হয় মধুপুরে পাথরোল নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশ লাল করে পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। বেশ ভাবে ছিলুম। হঠাৎ মুখার্জি সায়েব এসে ভাব চটকে দিলেন।

দু'আঙুলে নস্যির টিপ। সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কেমন আছেন ?

ভাল আছি স্যার। আপনি !

চলছে। চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের কৃপায়।

বেশ নাদুস নুদুস বিশ্বাসী মানুষ। এক সময় অধ্যাপনা করতেন। এই চাকরিতে মাঝামাঝি জায়গায় ঢুকেছিলেন। চর চর করে ঠেলে ওপর দিকে উঠে গেছেন। এঁর জীবনে দুটি হবি। এক নম্বর, উঁচু পোস্ট খালি দেখলেই ইন্টারভিউ দেওয়া। সে যেখানেই হোক। দু'নম্বর, একটু লেখা।

প্রথমটা আমাদের কাছে তেমন ভীতিপ্রদ নয়। লেখাপড়া করে উনি ইন্টারভিউ দেবেন, সে তো নিজের পাঁঠা। তার জন্যে দু-একটা বইপত্তর যোগাড় করে দেবার অনুরোধ, এমন কিছু বড় বায়না নয়। রাখলে রাখা যায়, না পারলে বলে দেওয়া যায়।

দু'নম্বর হবিটাই আমাদের পক্ষে বেশ ভীতিপ্রদ, অন্তত আমার পক্ষে। এই সায়েবটি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। তখন আকাশ অন্ধকার। দরজার পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে ঝাঁ করে দাড়িটা কামিয়ে নেন। তারপর পায়চারি করতে করতে মাথায় ভাব এসে যায়। পাখির মতো একটা দুটো করে লাইন আসতে থাকে ডানা মেলে। বেগ যখন বেশ টনটনে হয়ে ওঠে, ধাঁ করে চলে আসেন লেখার টেবিলে। প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে প্রথমেই লেখেন—ওঁ সরস্বতী। তারপর গড়গড়িয়ে কলম চলল। ভূতাবিষ্টের মত লিখেই চললেন। সকালে বাজারের ভাবনা নেই। ফেরার পথে সন্ধেবেলাতেই সেরে ফেলেন। ভাবের মাত্রা এমন মাপাপাত্রে আসে যেন টাইম বোমা। সাড়ে সাতটা বাজল, শেষ লাইন নেমে গেল। লেখার তলায় খ্যাঁস করে একটা দাঁড়ি, দুটো ফুটকি। ফিনিস।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত নিষ্ঠাবান কর্মী। অফিস দশটায়।

আসেন ঠিক ন'টায়। অফিসে বসেই সাইরেন শোনেন। আর আমরা, যারা অবশ্যই দেরিতে আসি আর তাড়াতাড়ি চলে যাই, তাদের মাঝেমধ্যেই ডেকে ডেকে বলেন, ঠিক সময়ে অফিসে আসা একটা সৎ অভ্যাস। দেশের মানুষ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা নীতিভ্রষ্ট হলে জাতি নীতিভ্রষ্ট হবে। ফলো মি। রাত দশটা বাজলেই আমি শুয়ে পড়ি, উঠি ভোর চারটেয়। যত ভোরে ওঠা যায় ততই দিন বড় হয়। কাজের সময় বেড়ে যায়। আমি নিজে হাতে সব কাজ করি।

বড় কর্তা যখন, তখন তো মাইলড কিম্বা কড়া ডোজে উপদেশ দেবেনই। পিতা অন্ন দেবেন, শিক্ষক কান মলে দেবেন, কবিরাজ পাঁচন দেবেন, স্ত্রী মুখ ঝামটা দেবেন, প্রতিবেশী বাঁশ দেবেন, পুত্র দুঃখ দেবে, গুরু দীক্ষা দেবেন, গাভিন হলে গরু দুধ দেবে, যার যা ধর্ম। আমরা এ কান দিয়ে শুনি ও কান দিয়ে বের করে দি। ঈশ্বর দুটো কান দিয়েছেন কেন?

মুখার্জি সায়েব সাজ পোশাকে খুব সাদাসিধে। ঝলঝলে প্যান্ট জামা। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। শীতে একটা আকার আকৃতিহীন কোট বেরোয়, গলায় একটা টাই ওঠে। নস্যি নাকে পুরে, চারপাশে বেশ ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। দপ্তরে আমি একা কুম্ভ। বিমল ছুটির ওপর ছুটি চাপিয়ে চলেছে। রবিবারের পর সোমবারেই ওর বেরতে ইচ্ছে করে না। দীর্ঘ ছুটির পর নাকি চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। বৃদ্ধ পিতা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করলে তবেই আবার কোঁত পাড়তে পাড়তে অফিসে আসে। সেই ঠ্যাঙাটি মনে হয় এখনও বেরোয়নি।

মুখার্জি সায়েবকে দেখলে ভীষণ আতঙ্ক হয়। মন বলে ওঠে, এই রে মরেছে। নিজের চেম্বারে টেনে নিয়ে যাবেন, পাঁচনের মত এক কাপ চা খাওয়াবেন, মুখটা বেঁকে মেরে যাবে। তারপর মড়াখেকো একটা ফোলিওব্যাগ থেকে, মোটা খাতা বের করে একের পর এক কবিতা পড়তে থাকবেন। ওঁর ধারণা, ওগুলো খুবই উচ্চ স্তরের মাল, জীবনদর্শনের মশলায় ঠাসা, তেমনি তার কারিকুরি। ধৈর্য ধরে শুনলুম, বাঃ বেশ হয়েছে, বলে সরে পড়লুম, সেটি হচ্ছে

না। সে গুড়ে বালি। প্রতিটি কবিতার ব্যাখ্যা চাই। কী বুঝলে মানিক, বলো দেখি! ফলে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কী লিখেছেন, কারুর বাবার ক্ষমতা নেই ধরে। নিজেও হয়ত জানেন না। ব্যাখ্যা শুনে বলবেন, হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক, তুমি অবশ্য অন্য রাস্তায় গেলে। তা হোক. ভাল, কবিতার ধর্মই হল, যে যেমন বোঝে। ছটা বাজবে, সাতটা বাজবে, অফিস খাঁ খাঁ করবে, অফিস পাড়া নির্জন হয়ে যাবে, তখনও কবিতা চলবে। অর্ডারলি পিওন টুলে বসে ঢুলতে থাকবে। ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদার বারেবারে উঁকি মারতে থাকবে। চোখাচোখি হলেই বলবে, সেলাম সায়েব। সায়েব অন্যমনস্কে বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাম।

জীবনের জানালা আছে
নীলডানা গণেশের গাত্র চর্মে
হৃদয়ের হাসি শুনি
বিধবার নিমীলিত চোখে॥

সেলাম সায়েব। হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাম।

মাঝরাতে ফিটনের চাকা ঘোরে
দুর্দান্ত ঝড় ওঠে
কদম্বের চুলচেরা বুকে,
সাজানো অজানা
পণ্ডিতেরা তর্ক জোড়ে
টোল ভেঙে পড়ে

সেলাম সায়েব.

হবে হবে সব হবে
মৃত্যু মেতে ওঠে
প্রেয়সীর
অস্পষ্ট জটার বাঁধনে।

সুইপার মরীয়া হয়ে চিৎকার করে উঠবে, সেলাম সায়েব। আমিও সাহস করে বলব, স্যার প্রায় আটটা বাজল।

তাই নাকি? তা হলে চলো ওঠা যাক।

উঠতেও অনেকখানি সময় লাগবে। সমস্ত টেবিল-সজ্জা একে

একে একে ড্রয়ারে ঢুকবে। তিনটে ক্যাবিনেটে চাবি পড়বে, সেই চাবি আবার আর একটা লকারে গচ্ছিত হবে। সেই লকারের চাবিটি ব্যাগে ঢুকবে। নিজের হাতে দুটো জানলা বন্ধ করবেন। একটা মাত্র আলো রেখে বাকি আলো আর পাখার সুইচ অফ করবেন। তারপর যাবেন বাথরুমে। ফিরে এসে বলবেন, চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি। সে আবার আর এক বাঁশ। আমাকে উজিয়ে ফিরে আসতে হবে ধর্মতলা। সেখান থেকে শুরু হবে গৃহযাত্রা। বাড়ি যখন ফিরব তখন চোরেদের সিঁদ-কাঠি নিয়ে জীবিকায় বেরোবার সময় হয়েছে।

মুখার্জি সায়েব মুচকি হেসে বললেন, কী, আজ আমাদের সিটিং হবে না কি? নাঃ, আজ থাক।

হাতে যেন স্বর্গ পেলুম, হ্যাঁ স্যার, আজ থাক।

কেন থাক বল তো?

অধ্যাপক ছিলেন, তাই সব সময়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা খোঁজেন। বললুম, তা তো জানি না স্যার।

আচ্ছা, এর মধ্যে তুমি কি দুর্গাপুজোর ওপর কোনও কিছু লিখেছিলে?

মরেছে, 'হ্যাঁ' বলব, না 'না' বলব! এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

বিমলের কথাই বোধহয় ফলতে চলেছে। কালিদাস ডাল কেটে কবি হয়েছিলেন, আমি বেকার হব। ভয়ে ভয়ে বললুম, হ্যাঁ স্যার।

ধরেছি ঠিক। আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

কেন স্যার, কী হয়েছে?

মার দিয়া কেল্লা।

কার কেল্লা স্যার! আমার কেল্লা?

একরকম তোমারই কেল্লা বলতে পার।

চাকরিটা গেল স্যার?

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় একবার দ্যাখো। মন্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে, একেবারে উচ্ছ্বসিত। আমাকে আজ বললেন, মুখার্জি, একবার খোঁজ করুন তো, ও-জিনিষ মাথামোটা ব্যানার্জির

কলম থেকে বেরবে না। ফাইন্ড আউট দি ম্যান। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, এ তোমার কাজ। ওই কাঁচা-খেকো দেবতাকে সন্তুষ্ট করা কম কথা? এইবার দেখা যাক তোমার জন্যে একটি নতুন পোস্ট তৈরি করা যায় কিনা। প্রত্যেকবার ফাইনান্স বাগড়া দেয়।

মনে মনে বললুম, ওই জন্যেই তো স্যার, বসে বসে আপনার ভাট্ট কাব্য শুনি, একটাও হাই তুলি না। মাথা খাটিয়ে উদ্ভট লাইনের ব্যাখ্যা খুঁজি।

তা হলে চলো।

কোথায় স্যার?

মন্ত্রী সকাশে।

আমাকে আবার টানাটানি কেন?

তার মানে? মন্ত্রী তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলছেন।

ছুটি হতে এখনও কিন্তু ঘন্টাখানেক বাকি, এই দপ্তর কিন্তু বন্ধ করে যেতে হবে।

হ্যাঁ, বন্ধ করেই যাবে। তুমি তো রাজদর্শনে যাবে। সাত খুন মাপ।

আপনিই বলেছিলেন, জনসংযোগ দপ্তর ঠিক সময় খুলবে, ঠিক সময়ে বন্ধ করবে।

আজ আর কোন নিয়ম নেই। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করতে পারেন, মন্ত্রী পারেন না। নাও, উঠে পড়।

অগত্যা উঠতেই হল। পাশ কাটানো গেল না। বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুখার্জি সায়েব ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, অ্যাসেমব্লি চল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে। যতই বলছেন ভয়ের কী আছে, খেয়ে তো আর ফেলবেন না, ততই ভয় বেড়ে যাচ্ছে। একটু বড় বাইরে বাইরে ভাব।

॥ তিন ॥

অ্যাসেমব্লিতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর একটি ঘর।

মন্ত্রীরা সব সময়েই মাননীয়। সায়েবরা বলেন অনারেবল। আমি এক মন্ত্রীর স্ত্রীকে জানি যিনি জেলা পরিদর্শনে গিয়ে ভোরবেলা ডাকবাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে জনৈক তটস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বলেছিলেন, অনারেবল মিনিস্টার রোজ দেড় সের পরিমাণ খাঁটি দুধ খান। আপনি অবিলম্বে সেই দুধের ব্যবস্থা করুন।

ইয়েস ম্যাডাম বলে তিনি যেই দৌড়তে যাবেন অধস্তন বললেন, দিক ঠিক করে দৌড়ন স্যার। পুরুলিয়া শহরে গবাদি পশুর বড় অভাব, দু' একটা চা-গরু মিলতে পারে, দেড় সের খাঁটি দুধ পাবেন কোথায়?

দ্যাট্স নট ইওর লুক আউট, বলে তিনি ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে ভূতেধরা মানুষের মত গোল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলুম চা-গরুটা কী জিনিস মশাই।

আরে ম্যান চা-গরু অনেকটা ছাগলের মত দেখতে হয়। যখনই বাঁটে হাত দেবেন, ছিড়িক করে এক চামচে দুধ ছাড়বে, এক কাপ চা করার মত। আমরা নাম রেখেছি চা-গরু।

এ দেশে মন্ত্রীরাই শুধু বুদ্ধিমান নন, বুদ্ধিমান প্রজারও অভাব নেই। গুঁড়ো দুধ ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলে বটের আঠা মিশিয়ে দেড় সের খাঁটি গো-দুগ্ধ তৈরি হল। বটের আঠা কম বলকারক। ছটা বাচ্চা পেড়ে ছাগল যখন নেতিয়ে পড়ে তখন বটপাতা খাইয়ে তার স্তনে দুধ আনা হয়। বৃক্ষ ... মন্ত্রী বট, আহার বটদুগ্ধ।

অ্যাসেমব্লিতে মন্ত্রী মহোদয় বসে আছেন। চোখ জবাফুলের মত লাল। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সবসময় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে মুখটাই ডিসফিগার্ড হয়ে গেছে। অনবরত চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে গলা হয়েছে ফাটা কাঁসরের মত।

চোখ দুটো মোটরগাড়ির ব্যাকলাইটের মত। জ্বলছে, জ্বলবে। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন কী চাই? মুখার্জি সায়েব থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে এনেছি।

ঠেঙিয়ে ব্যাটার নাম ভুলিয়ে দাও।

মুখার্জি সায়েব মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আজ্ঞে স্যার।

আপনাকে নয়, চুপ করে বসুন। আমি সনাতনকে বলছি। অপদার্থ শয়তান। পুলিশ কী করছে? তোমাদের পুলিশ?

ধরছে আর ছাড়ছে। এ মুখ দিয়ে ঢুকছে, ও মুখ দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসছে।

মন্ত্রী টেবিলে এক ঘুসি মেরে বললেন, এই আমলারা, রাসকেল আমলারাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে গদি টলিয়ে দিলে। গেট আউট।

সনাতন বললেন আমি আবার কী করলুম।

তোমাকে বলিনি পাঁঠা। আমি এই মুখার্জিকে বলছি।

মুখার্জি সায়েব কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, আমাকে স্যার আমলা বলবেন না। আরও দুধাপ ওপরে উঠলে তবেই আমলা হতে পারব।

তাহলে বসুন। সনাতন তুমি যাও। তোমাদের দ্বারা কিসু্য হবে না। আমার নাম জপে যদ্দিন গদিতে আছি, যা পার কামাই করে নাও। গাড়ির পারমিট বেরিয়েছে?

কবে!

নেমে গেছে?

কাল নামছে।

তবে আর কি? যাও বোতল খুলে বসে পড়।

লোহার পারমিটটা যে এখনও আটকে আছে।

কেন?

তা তো জানি না। ফাইলটা আটকে রেখেছে।

হোয়াট। মন্ত্রীর অর্ডার চেপে রেখেছে। আমি এই সান্যালের প্যান্ট খুলে নেবো। অফিসার হয়েছে, অফিসার।

হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নিলেন।

মুখার্জি সায়েব মিউ করে বললেন, মিস্টার সান্যাল স্যার পোল্যান্ড গেছেন।

পোল্যান্ড। পোল্যান্ডে কেন ?

আজ্ঞে লোহা চিনতে।

অপদার্থ। কে অ্যালাউ করেছে ?

আপনিই স্যার করেছেন।

আই ওয়াজ মিসলেড।

মিঃ সান্যাল স্যার সি এমের লোক।

এই সি এমরাই দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে। কবে যে আবার ওয়ান পার্টি রুল হবে। সামনের বার আমাকে সি এম হতেই হবে। সনাতন ?

বল দাদা।

আরও এম. এল. এ চাই। মেজোরিটি আমার। তোমাকে আমি লোহা দিয়ে ইস্পাত দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে মুড়ে দোব।

দেশের লোক দাদা বড় সেয়ানা হয়ে গেছে।

বোকা বানাবার কল চালু করে দাও! এখনও সময় আছে। নাউ অর নেভার। এখন তুমি যাও তাহলে, অ্যাঃ।

সনাতন নামক জীবটি মাখনের মত মাখোমাখো হাসিতে মুখ ভরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হাসি যেন মুখ ছেড়ে আধ হাত লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘর খালি হল। মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ সাহিত্যসভার প্রধান অতিথির মত ভীষণ গোমড়া হয়ে আছে। যে জানে না, সে দেখলে ভাববে, বউ বুঝি খুব বকেছে। এ যে পলিটিক্যাল মার বাবা। কোথায় কে এক অপোনেন্ট অ্যায়সা কলকাঠি নেড়েছে, আসনে ভূমিকম্প।

টেবিলে তিনবার টোকা মারলেন। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মুখার্জি সায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আর মানুষ হলেন না।

কেন স্যার ?

সব অসতী, অসতী। ঘর করছেন একজনের সঙ্গে, শুতে যাচ্ছেন আর একজনের সঙ্গে। আপনারা হলেন বাজারের বেশ্যা।

এ স্যার কী বলছেন ? ছি ছি।

চুপ, প্রতিবাদ করার সাহস আসছে কোথা থেকে! বাইরের খোলসটা হল সতীসাধ্বীর আর ভেতরের ভাবটা হল বারবনিতার। এক বাবুতে মন ওঠে না। নতুন নতুন চাই, নতুন নতুন।

হৃষ্টপুষ্ট মন্ত্রী মহোদয় চেয়ারে বসে বসেই স্প্রিঙের মত নাচতে লাগলেন, ওপর নিচ, নিচ ওপর।

নতুন নতুন বলার সময় মুখের চেহারা হল কোলাব্যাঙের মত। ডোবায় বসে ডাকছেন যেন, গ্যাঙোর গ্যাং। আচ্ছা জায়গায় এনে ফেললেন আমার শুভানুধ্যায়ী মুখার্জি সায়েব। একেবারে বাঘের ঘরে চার পাশে ঘোগের বাসা।

নাচ করে মন্ত্রী মহোদয় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, মুখার্জি, আমি প্রতিবাদ পছন্দ করি না। যা বলব, তা মানতে হবে। মন্ত্রীর অবজার্ভেশানে কখনও ভুল হয় না। ভুল হলে দেশ শাসন করা যেত না বুঝেছেন ?

ইয়েস স্যার।

হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আমরা ইয়েসম্যানই পছন্দ করি। ওই সান্যালটার আমি বারোটা বাজাবই। পোল্যান্ডে গেছে, আর একটু ঠেলে কুমেরুতে পাঠিয়ে দোব রাসকেল।

মুখার্জি সায়েব বললেন, আমি প্রতিবাদ করিনি স্যার। শুধু বলতে চেয়েছিলুম, আমি ওই গণিকাদের দলে পড়ি না। আই অ্যাম সো ডিভোটেড টু ইউ।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না মুখার্জি। প্রমাণ চাই, প্রমাণ। ডিভোসনের প্রমাণ।

কীভাবে স্যার।

ওই সান্যালের চেয়ারে আপনাকে আমি বসাব। ওই চেয়ারে আমি আমার লোক চাই।

কী করে বসব স্যার ?

ফুল, দ্যাটস নট ইওর লুক আউট, আই উইল অ্যারেঞ্জ ইওর প্রমোশান।

কিন্তু সি এম ?

ইডিয়েট। আমি দুর্নীতির অভিযোগ এনে হারামজাদাকে সাসপেন্ড করব। আপনাকে দোব প্রমোশন। বাট ইউ মাস্ট বি ভেরি অনেস্ট। আমার লোককে আপনি র মেটিরিয়েল দেবেন উইদাউট এনি হ্যারাসমেন্ট।

অফকোর্স স্যার।

আ, এই ছেলেটি তাহলে আমার সেই বক্তৃতা লিখেছিল ?

হ্যাঁ স্যার।

চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নমস্কার করলুম। ধাঁই করে টেবিলে হাঁটু ঠুকে গিয়েছিল। মনে মনে বাপ বললুম। মুখে যেন যন্ত্রণার রেখা না পড়ে। তাহলে কেস কেঁচে যাবে। যাঁর সামনে এসে বসেছি তাঁর একটা আঙুল নাড়ায় আমার বরাত ফিরে যেতে পারে। কতদিন ধরে জীবনবৃক্ষে মুকুল আসছে, ফল ধরছে, ঝরে পড়ে যাচ্ছে, পাকছে না। এইবার এমন সার পড়তে পারে হয় গাছ জ্বলে যাবে নয়তো পদোন্নতির ফল পাকবে।

বোসো বোসো, হি লুকস্ ভেরি ইনোসেন্ট। তোমার লেখায় বেশ ডেঁপোমি আছে হে। আমাদের গ্রাম্য ভাষায় তোমাকে পেছন-পাকা বলা যেতে পারে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রাজনীতি করো ?

আজ্ঞে না স্যার।

এই রকম একটা দুটো র মাল আমার চাই মুখার্জি। বাইরে ইনোসেন্ট, ভেতরে শয়তানি। তোমাকে আমার কাজে লাগবে। যাও। এখন যাও। আমার কাজ আছে।

আমরা দু'জনে সমস্বরে ইয়েস স্যার বলে উঠলুম।

মুখার্জি সায়েব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, যাক, তোমার কপালটা এত দিনে ফিরল। একই পোস্টে ঘ্যাঁসড়াচ্ছো বছরের পর বছর।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, একবার তো আপনার জন্যই আমার প্রমোশন হল না। আপনার ভাগনেকে লড়িয়ে দিলেন।

এ তুমি কী বলছ ? নিজের ভাগনে আগে না তুমি আগে ?

এর পরের চান্সে তোমারই হত।

আপনার কী মনে হল?

তার মানে?

এই যে মন্ত্রী বললেন, পেছন-পাকা, ভেতরে শয়তানি, চাকরিটা যাবে না তো?

আরে না না, ওসব সোহাগের কথা। মেজাজ এখন খুব চড়েই থাকবে। টার্ম শেষ হয়ে আসছে, ইলেকশান প্রায় এসেই গেল। চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি।

সেরেছে রে, আবার মানিকতলা।

মানিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি দাঁড়াল। সায়েব বাজার করবেন। আমাকে বললেন, এত ভাল আর রকম রকম মাছ তুমি কলকাতার অন্য কোনও বাজারে পাবে না। মাছ কিনবে নাকি?

অপরাধীর মত মুখ করে বললুম, আমার মাছ কে রাঁধবে স্যার। মনে মনে বললুম, আপনি তিন হাজারি মনসবদার, ছরকম মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারেন। আমাদের একবেলা এক চিলতে জোটাতেই জিভ বেরিয়ে যায়।

তিন রকমের ব্যাগ হাতে গাড়ি থেকে নামতে নামতে মুখার্জি সায়েব বললেন, বুঝলে, আমি একটু ভোজনবিলাসী। তিন রকমের মাছ না হলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সবাই ঠাট্টা করে বলে মৎস্যাবতার। মাছের কপালটাও আমার ভাল। এই বাজারে ঢুকলেই দেখতে পাবে।

আমিও যাব স্যার?

বাঃ, মাছ দেখবে না! সব রকম মাছ তুমি চেন?

একটা মাছই আমি চিনি, তা হল কাটাপোনা।

কাটাপোনা, হাঃ হাঃ, কাটাপোনা আবার মাছ নাকি হে। চলো চলো, ফলুই দেখবে চল। রুপোর মত চেহারা। জলের গামলা ছেড়ে দশ বারো হাত করে লাফিয়ে উঠছে।

কলকাতায় বেশ কাঁঠালপাকা গরম পড়েছে। প্রাণ একেবারে আইঢাই। সবে সকাল সাড়ে দশটা। শহরে যেন আগুন ছুটছে। জামার বুকের সবকটা বোতাম খুলে দিয়ে বিমল চেয়ারে বসে

ঝিমোচ্ছে। কাল সারারাত কোথায় গান গেয়ে এসেছে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

হ্যাঁ বলছি।

একবার আসতে হচ্ছে।

এখনি ?

হ্যাঁ, এক্ষুনি। অনারেবল মিনিস্টারের তলব।

আপনি কে বলছেন স্যার ?

অনারেবল মিনিস্টারের পি এ।

অনারেবল মিনিস্টারের ঘর খুঁজে পেতেই জীবন বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহলে এত ঘুরপাক। দেউড়ির পুলিশকে বলা ছিল, তাই কাছা ধরে টানেননি।

চারটে টাইপরাইটার একই ছন্দে বেজে চলেছে। চারটে টেলিফোনের একটা থামে তো আর একটা বাজে। টেলিফোনের সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি অষ্টভুজ মহাদেবের মত টেলিফোনের ভোজবাজি দেখাচ্ছেন। তুলছেন, ফেলছেন, ফেলছেন, তুলছেন। যেন জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বলছে। এনগেজড। অনেকক্ষণ বসে আছি। একটু উসখুস করলেই প্রজাপতি গোঁফ-ওয়ালা এক ভদ্রলোক ধমকের সুরে বলছেন, চুপ করে বসুন। সময় হলেই ডাক আসবে। আচ্ছা ল্যাঠা রে বাবা! আমি তো আসিনি, তিনিই তো ডেকেছিলেন।

অবশেষে ডাক এল। প্রজাপতি গোঁফ ধমকের সুরে বললেন, যান, ডাকছেন।

সব মেজাজ দ্যাখো! যেন ঘেয়ো কুকুর! মন্ত্রী মহোদয়ের হাওয়া লেগেছে আর কি! নীল রঙের দরজা ঠেলে ঘরে পা রাখতেই, পা যেন ডুবে গেল। জলে নয়, নরম কার্পেটে। টেবিলের সামনে পাঁচটা সারিতে অন্তত কুড়িটা চেয়ার। ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে বিশাল একটি টেবিল। টেবিলের আবার একতলা, দোতলা হয় এই প্রথম দেখলুম। অনেকটা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি গোছের অভিজ্ঞতা। একতলায় কাঁচ লাগানো, তার ওপর মন্ত্রী মহোদয়ের

হাত। দোতলায় ব্যালকনিতে যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার, যেন খেলার সামগ্রী। কলমদানি, ভেলভেটের পিনকুশান, হ্যানাত্যানা। সারা ঘরে হিলহিল করছে একটা যান্ত্রিক ঠাণ্ডা।

মন্ত্রী মহোদয়ের কাশি হয়েছে। বিশ্রী কাশি। সাইবেরিয়ায় যেন হায়না কাশছে। ঘরটা এত পেল্লায়, ক্ষমতার ঘূর্ণায়মান আসনটি এত বিরাট, আর আমি এত ক্ষুদ্র, মনে হল, আমি একটা টিকটিকি। টকটক না করলে, নজরেই পড়ব না।

সেই গানটা মনে খেলে গেল, আমি এসেছি, আমি এসেছি-ই, বঁধু হে। লয়ে এই হাসি রূপ গান।

দরজা থেকে দুপা এগিয়ে, দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ঘোষণা করলুম, আমি এসেছি স্যার।

দেখেছি। অমন ন্যাকা সুরে কথা বলছ কেন? লিঙ্গ ঠিক আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিতীয় সারির তিন নম্বর চেয়ারে বোসো।

ভয়ে ভয়ে বসলুম। সংবর্ধনাটা তেমন সুবিধের হল না। লিঙ্গ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মেডিকেল বোর্ডে না পাঠিয়ে দেন! আজ আবার চোখে চশমা উঠেছে।

মৌমাছি কাকে বলে জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যে মাছি মধু দেয়।

তোমার মাথা। একি গরু যে পালান ধরে চ্যাঁক চোঁক করলেই দুধ দেবে! মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করে চাকে রাখে। বুদ্ধিমান মানুষ চাক ভেঙে সেই মধু খায়। ভাল্লুকেও খায়। আমাদের এই রাজনীতির মত। আমরা চাক বেঁধে মধু সঞ্চয় করে যাচ্ছি, বিরোধী ভাল্লুকেরা এসে সব সাবাড় করে দেবে। মধু খেয়েছো?

ছেলেবেলায় স্যার, সেই জন্মাবার পরেই, ঠোঁটে একবার দেওয়া হয়েছিল।

গাধা কোথাকার! আমি রোজ চার চামচে মধু দিয়ে পাতিলেবুর রস খাই।

ভীষণ দাম।

লিখতে পারবে?

কী লিখতে হবে বলুন?

পশ্চিমবাংলায় মৌমাছির চাষ। জমি কুপিয়ে, মৌমাছির বীজ ছড়িয়ে চাষ নয়, মৌচাক বসিয়ে মাছির চাষ। গাধাদের বিশ্বাস নেই। তিন পাতা ধান চাষ লিখে, দাঁত বের করে সামনে এসে দাঁড়ায়, এনেছি স্যার।

পারব স্যার। বারুইপুরে মৌমাছির চাষ আমি দেখে এসেছি।

হুঁ। শোনো, মৌমাছির সঙ্গে একটু রাজনীতি ঢুকিও। বেশ কায়দা করে ঝাড়বে। এখন বাজে বেলা বারোটা। তিনটের মধ্যে চাই। তুমি দুটোর মধ্যে দেবে। তারপর টাইপ হবে। চারটের সময় আমাদের পেঁছিতে হবে। টিভি সেন্টারে। সংস্কৃত কোটেশান একদম ব্যবহার করবে না। আমার ফল্স টিথ, উচ্চারণে ভীষণ অসুবিধে হয়।

মুখে এসে গিয়েছিল, প্লেব্যাক করলে কেমন হয় স্যার! ভাগ্যিস বলে ফেলিনি।

মাত্র দু'ঘণ্টা সময়, তিন পাতা লিখতেই হবে, নয়তো চাকরি চলে যাবে। কী এখন লিখি? প্রথমেই লিখি, মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াবার সময় তো নাই। পরোপকারী মৌমাছি, হুল ফোটালেও গাছে গাছে মানুষের জন্য অমৃতকোষ ঝুলিয়ে রাখে। মৌমাছি আর আদর্শ রাজনৈতিক দল-নেতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই যা করেন, সবই মানব হিতার্থে। হিতার্থে শব্দটা চলবে না। দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে। ফলস টিথে অসুবিধে হতে পারে। মানব কল্যাণে। না চলবে না। য-ফলা আছে। মানুষের উপকার লিখি। সহজ সরল যুক্তাক্ষর বর্জিত।

মৌমাছি একশো মাইল রেডিয়াসে, ও বাবা রেডিয়াস আবার ইংরেজি শব্দ, একশো মাইলের পরিধিতে ওড়াউড়ি করে, ফুলে ফুলে, ফুলিফুলি মধু সংগ্রহ করে এনে, মোমচাকের কন্দরে কন্দরে মধুভাণ্ডে মধু সঞ্চয় করে। ফ্লো এসে গেছে।

এই মধুই হল সেই অমৃত যে অমৃত উঠেছিল সমুদ্রমন্হনে, সেই

অমৃত যে অমৃত অসুররা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, দেবতারা কৌশলে কেড়ে নিয়েছিলেন। বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলার অমৃতভাণ্ডে, আমাদের শ্রমে, নিষ্ঠায়, দেশহিতব্রতে উন্নয়নের যে মধু সঞ্চিত হয়েছে একদল উন্মত্ত, লোমশ ভাল্লুক, মাতোয়ালা হয়ে রাতের অন্ধকারে তা খেয়ে চলে যাবে, একি আপনারা সহ্য করবেন? অসুরকুলের এই ঘৃণ্য প্রয়াস আমাদের রুখতেই হবে। রুখবোই, রুখব।

মধুর মত মধুর বস্তু আর কী আছে! উপনিষদ বলছেন, ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো ইত্যাদি। মধুর একেবারে ছড়াছড়ি। দ্রব্যগুণে মধুর কোনও তুলনা হয় না, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, ফ্রাকটোজ, ক্যালোরিতে ঠাসা, এক এক ফোঁটা, এক একটি অ্যাটম বোমা। অ্যালকোহল রক্তে মিশতে ছ ঘণ্টা সময় নেয়। মধু জিভে পড়ামাত্রই রক্তে মিশে যায়। মধু দিয়ে মকরধ্বজ মেড়ে খেলে মানুষ শতায়ু হয়।

বন্ধুগণ, আপনারা ঘরে ঘরে বাক্স চাক বসিয়ে মৌমাছি পালন করুন। মধুর উৎপাদন বাড়ান। মধু মানে স্বাস্থ্য, মধু মানে যৌবন, যৌবন মানে জীবন, জীবন মানে জাতি। কর্মে, ধর্মে, মর্মে বাঙালী জেগে ওঠ। আমরা বড় পেছিয়ে পড়েছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

আঃ, টেরিফিক লিখে ফেলেছি। বাচ্চেলোক এক দফে তালি বাজাও।

দুটো বেজে দশ মিনিটে বক্তৃতা মন্ত্রীর হাতস্থ হয়ে গেল। নিজেই নিজেকে বললুম, কামাল কর দিয়া গুরু।

মন্ত্রী মহোদয়ের খুব পছন্দ হয়েছে মনে হল। সংস্কৃত শ্লোকটির ব্যাপারে সামান্য একটু আপত্তি তুললেন। ওটাকে বাদ দিলে কেমন হয়।

শ্লোকটার লাইনে লাইনে স্যার মধু। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কবে আবার মধু হবে।

থাক তা হলে। গাড়িতে যেতে যেতে তুমি আমাকে বার কয়েক তালিম দিয়ে দিও। তিনটে পাঁচে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হল। সামনে দুজন বডি গার্ড। পেছনে আমরা তিনজন। একজন হলেন মন্ত্রী মহোদয়ের পি.-এ।

যেতে যেতে শ্লোকের তামিল চলেছে। বলুন স্যার, ওম্। উঁহু ওঁ নয় অউম্।

খুব ক্ষেপে গেলেন, লিখেছ ওঁ, বলতে বলছ অউম্।

আজ্ঞে খাস সংস্কৃত ওঁ, এর উচ্চারণ অউম্, যেমন বাডজেটের উচ্চারণ হল বাজেট। বলুন স্যার, মধুবাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। ক্ষরন্তি নয়, উচ্চারণ হবে হ্খসরন্তি।

বেশ জুতসই একটা গালাগাল দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। আমাদের ওভারটেক করে পাশ দিয়ে সাঁ করে আর একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহোদয় চমকে উঠে বললেন কে গেল, মনে হচ্ছে আর একজন মন্ত্রী গেলেন।

পি. এ কিছুই দেখেননি। ভিকটোরিয়ার মাঠে জোড়া শালিক দেখছিলেন। বোকার মত বললেন, না, স্যার।

তুমি থামো, গবেট কোথাকার, আমি গাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়তে দেখেছি।

সামনের বডিগার্ডের মধ্যে একজন বললেন, হ্যাঁ স্যার মন্ত্রী গেলেন।

আমি দেখেছি। জঙ্গল আমাকে ওভারটেক করে চলে গেল।

জঙ্গল মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। অরণ্য দপ্তরের মন্ত্রী। রাগে রাগে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ জবা ফুলের মত লাল, হোয়্যার ইজ মাই ফ্ল্যাগ রাসকেল। মাই ফ্ল্যাগ।

আমি তোমার চাকরি চিবিয়ে খাবো গাধা। হোয়ার ইজ মাই ফ্ল্যাগ।

কাকে এইসব মধুর সম্ভাষণ হচ্ছে? গাড়ির সামনে ফ্ল্যাগ পতপতিয়ে দেবার দায়িত্ব কার! মন্ত্রী মহোদয় পেছন থেকে ড্রাইভারের ব্রহ্মতালুতে ঠাঁই করে একটা চাঁটা মেরে বললেন, কী, কথা কানে যাচ্ছে না।

গাড়ি হুড় হুড় করে রাস্তার বাঁ দিকে গিয়ে থেমে পড়ল। ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। বুড়ো হাবড়া, রাত কানা নয়, ফাইন ইয়ংম্যান। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেশ ডাঁটে দরজা বন্ধ করে, হন হন করে হেঁটে চলল ময়দানের দিকে।

আমরা সকলেই হাঁ হয়ে গেছি। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা খেলে, রাতে বিছানায় ছোট বাইরে করে ফেলার কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে

শুনে আসছি। এতো দেখছি সঙ্গে সঙ্গে কুইক অ্যাকসান।

মন্ত্রী বললেন, যাচ্ছে কোথায়, রাসকেল যাচ্ছে কোথায়?

একজন বডিগার্ড সামনের দিক থেকে নেমে পেছন পেছনে দৌড়ল। আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি না, দূর থেকে মূকাভিনয় দেখছি। দু'জনেরই হাত পা খুব নড়ছে। বডিগার্ড ভদ্রলোক ঘাড় ধরে ড্রাইভার ছেলেটিকে আমাদের দিকে টেনে আনছেন।

মন্ত্রী মহোদয় রাগে পাঞ্জাবি খামচাচ্ছেন। বুকের কাছটা গিলে হয়ে গেল। লোকে মন্ত্র জপ করে। মন্ত্রী মহোদয় ক্রমান্বয়ে বলে চলেছেন, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা। গাড়ির কাছাকাছি আসতেই, মন্ত্রী বললেন, ওর কানটা একবার খালি আমার হাতে ধরিয়ে দাও। তারপর যা করার আমিই করছি।

ছেলেটার কি প্রাণের মায়া নেই? বেপরোয়ার মত বললে, যান, যান সব করবেন।

আমার হাঁটুতে বিশাল এক চড় মেরে, মন্ত্রী স্প্রিংয়ের মত নাচতে লাগলেন, জুতো, জুতো পেটা করব! জুতো পেটা করব।

ড্রাইভার বললে, বাংলা বনধ করে দোব।

মন্ত্রী বললেন, ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র, কনসপিরেসি, কনসপিরেসি। এ ব্যাটাকে বিরোধীরা ফুসলে নিয়েছে। হ্যাঙ হিম, কিল হিম, শুট হিম।

মটোর সাইকেলে একজন সার্জেন্ট যাচ্ছিলেন। এ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাবার নিয়ম নেই। বাইক ঘুরিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। খুব তড়পাবার তালে ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়কে দেখে সটাস করে একটা স্যালুট ঠুকলেন।

কী হয়েছে স্যার!

রাগে মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকে কোনও রকমে বললেন, ওকে মেরে ফেল।

পি. এ মাথায় ফাইলের বাতাস শুরু করে দিয়েছেন। প্রেসার কোথায় উঠেছে কে জানে! চারশো টারশো হবে হয় তো।

সার্জেন্ট ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়ে গেছেন। এমত পথনাটক তিনি জীবনে দেখেছেন কি না সন্দেহ! বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

উনি পেছন থেকে আমার মাথায় চাঁটা মেরেছেন, বাপ তুলেছেন, জুতো মারার আগে আমি গাড়ি পার্ক করে নেমে পড়েছি। মন্ত্রী বলে হাতে মাথা কাটবেন নাকি!

মন্ত্রী মহোদয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হি'জ এ লায়ার।

ড্রাইভার বললেন, আপনি এঁদের জিজ্ঞেস করুন, মিথ্যে বলছি কিনা।

আমি মনে মনে বললুম, আমি অন্তত সাক্ষ্য দোব না, যে দেয় দিক। চাকরিটা যাক আর কি। জলে বাস করে, কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা। আমি বলে প্রমোশনের ধান্দায় তেলিয়ে চলেছি। মাস-খানেকের মধ্যে ফাইল না নড়লে হয়ে গেল। পরের নির্বাচনে কোন্ মহাপ্রভুরা দু'হাত তুলে নেচে নেচে আসবেন কে জানে!

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, কী করেছিলে তুমি?

কিছুই করিনি।

মন্ত্রী মহোদয় হাওয়া বেরতে থাকা বেলুনের মত ছটফট করতে করতে বললেন, রাসকেল পি. এ, তুমি কিছু বলছ না কেন? বোবা হয়ে গেছ। বোবা!

পি. এ বললেন, ও গাড়িতে ফ্ল্যাগ লাগাতে ভুলে গেছে।

ড্রাইভার বললে, আমি ফ্ল্যাগ পাব কোথা থেকে? তিনদিন আগে দুর্গাপুর থেকে আসার পথে, বর্ধমানে, জনতা গাড়ি থামিয়ে ওঁকে জুতোর মালা পরাতে গিয়েছিল। সেই সময় একশো মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমি ওঁকে বাঁচাই। সেই গণ্ডগোলের সময় পাবলিক ফ্ল্যাগটা খুলে নিয়েছিল। আমাকে না দিলে ফ্ল্যাগ আমি পাব কোথা থেকে স্যার! আপনিই বলুন।

মন্ত্রী মহোদয় জ্বলন্ত অঙ্গারের দৃষ্টিতে পি. এ-র দিকে তাকালেন। ওই দৃষ্টিতেই কাজ হল। পি. এ আমতা আমতা করে বললেন, স্যার আমি বলেছি, ডিপার্টমেন্ট দিতে দেরি করছে।

তুমি আমাকে বলনি কেন?

বললে কিছু হত না স্যার। ওটা অন্য দলের হাতে।

কন্সপিরেসি, কন্সপিরেসি, বলে মন্ত্রী দেহের হাল গাড়ির আসনে ছেড়ে দিলেন।

সার্জেণ্ট ড্রাইভারকে নরম গলায় বললেন, যাও গোলমাল কোর না, যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলে যাও। তোমার চাকরির মায়া নেই।

না স্যার, আমি তো কেরানী নই, ড্রাইভার। আমাদের লাইনে চাকরির অভাব নেই।

এভাবে গাড়ি ফেলে পালালে তোমার জেল হয়ে যাবে যে।

ড্রাইভার গাড়ির আসনে এসে বসতেই মন্ত্রী মহোদয় বললেন, অকৃতজ্ঞ বেইমান।

ড্রাইভারের সাহসও কম নয়, সে বললে, আপনিও।

হোয়াট!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিও।

জানো, তোমাকে আমি নিজে হাতে তুলে এনে স্টিয়ারিং-এ বসিয়েছি!

সে, আমার হাত ভাল বলে। একশো কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ মাইল স্পিডে কে আপনার গাড়ি চালাবে! ক'জন ড্রাইভার কলকাতায় আছে! আমি মিনি চালালে এর চেয়ে বেশি রোজগার করব। দিন নেই রাত নেই আপনার হোল ফ্যামিলির খিদমত খাটছি। মাইনে পাঁচশো, উপরি জুতো-ঝ্যাঁটা-লাঠি।

খুব লম্বা-চওড়া বাত হয়েছে তোমার। দাঁড়াও, ফিরে আসি।

ফিরে আর আসতে হচ্ছে না, এবার পাবলিকেই খতম করে দেবে। মেয়েমানুষের যৌবন আর নেতাদের গদি এক জিনিস।

আমি সে ফেরার কথা বলছি না গাধা। আজ ফিরে আসি, তারপর তোমাকে দেখাব কত ধানে কত চাল।

ভয় দেখালে ভিড়িয়ে দোব স্যার। স্টিয়ারিং আমার হাতে।

মন্ত্রী গুম মেরে গেলেন। আমি বললুম বলুন স্যার, মধু—ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বির্নঃ সন্তোষধী। মন্ত্রী মহোদয় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, ধ্যাততেরিকা মধু। রাখ তোমার মধু।

ওভারটেক করা মন্ত্রী আগেই এসে পড়েছেন। সাদা অ্যামবাসাডার এক পাশে বিশ্রাম করছে। যে পতাকা নিয়ে এত গোলমাল, সেই পতাকা গাড়ির ঠোঁটে নেতিয়ে পড়ে আছে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের পরাজয় মানে আমাদের পরাজয়।

মাথা নিচু করে হাঁটছি।

কানের কাছে মন্ত্রী ফাটলেন। বোমা ফাটার মতই ব্যাপার।

দাঁত খিঁচিয়ে বললেন এ কোথায় নিয়ে এলে, এটা তো টয়লেট।

মাথা নিচু করে হাঁটার পরিণাম। নেতাকেই সবাই অনুসরণ করে, নেতা যে এতক্ষণ আমাকেই অনুসরণ করছিলেন, জানব কী করে. ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের একজনের টনক নড়েছে। তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন, এদিকে স্যার এদিকে।

গোটা তিনেক দরজা ঠেলে, আমরা শীতপ্রধান এলাকায় রাগ-প্রধান মানুষটিকে নিয়ে প্রবেশ করলুম। রাস্তায় দেখেছি, ঠ্যালা চেপে প্যাকিং বাকস চলেছে, গায়ে লেবেল সাঁটা। তীর চিহ্ন, দিস সাইড আপ, সতর্ক বাণী, গ্লাস হ্যান্ডল উইথ কেয়ার। আমরা অনুরূপ একটি গোলমাল মানুষকে যে ঘরে এনে ফেলেছি, সেটি হল মেকআপ রুম।

বিজেতা মন্ত্রী মহোদয় আয়নার সামনে বসে পড়েছেন। জনৈক মেকআপ ম্যান তাঁর মুখমণ্ডল নিয়ে বড় ব্যস্ত। ঘষা-মাজা চলছে। পোড়া হাঁড়ি মাজার কায়দায়। নানা রকম মলম মালিশ করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাউডারের প্রলেপ পড়ছে। গায়ে একটা ছাপকা ছাপকা গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি। আমাদের পাড়ায় একজন দাদের মলম ট্রেনে ট্রেনে বিক্রি করতে বেরোবার সময় এই রকম আলখাল্লা ধরনের জামা পরেন। মানুষের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করার জন্য। দাদের মলম আর রাজনীতি প্রায় একই বস্তু। দুটোই চুলকুনির ওষুধ। সারুক না সারুক, লাগিয়ে যাও।

বিজিত মন্ত্রী মহোদয় মুখটাকে তোলো হাঁড়ির মত করে আর একটা চেয়ারে বসলেন। বেশ বোঝাই গেল দু'জনে বিশেষ সদ্ভাব নেই। উনি বোধহয় রাজনীতির সুতো টানাটানিতে ইদানীং শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ডানপাশে এলিয়ে পড়ে একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, দেরি করে ফেলেছেন দাদা, গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছিল বুঝি!

আমাদের মন্ত্রীও কোনও জবাব দিলেন না। আয়নায় নিজের

মুখের দিকে রাগ রাগ চোখে তাকিয়ে রইলেন। পারলে চড় কষাতেন।

মেকআপ ম্যান বললেন, এই সাদা পাঞ্জাবি চলবে না।

মন্ত্রী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, বাপ চলবে।

মেকআপ ম্যান বললেন, বাপস।

বাঁপাশের মন্ত্রী বললেন, ঠোঁটে একটু লিপস্টিক মাখলে মন্দ হয় না। চিত্রতারকারা মাখেন।

কালার টিভি হলে মাখিয়ে দিতুম স্যার।

আপনাদের এখানে হেয়ার ড্রেসার নেই ?

আজ্ঞে না স্যার। আমাদের এখানে সব কিছু ফেসিয়াল। মুখের ওপরেই যত অত্যাচার।

আমার ঝুলপি দুটো ঠিক সেপে নেই। দাড়ি কামাতে গিয়ে ছোট বড় হয়ে গেছে।

আমাদের মন্ত্রী এদিকে বিদ্রোহ করে বসে আছেন, মুখে কিছু মাখিয়েছ কি তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে দোব।

মুখটা বড়ো তেলতেল করছে স্যার।

পুরুষ মানুষের মুখ তেলতেলেই হয়। ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মেকআপ নেবে মেয়েমানুষ। বুঝেছ ছোকরা! মেয়েছেলের মুখে যা যা খুশি মাখাও।

অনুষ্ঠান পরিচালক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, হাত জোড় করে বললেন, স্যার ক্যামেরার খাতিরে মুখটাকে একটু পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। তা না হলে আলো জাম্প করবে।

আমি আমার ভোটারদের খাতিরেই কিছু করিনি, তুমি আমাকে ক্যামেরা দেখাচ্ছ।

সবাই করে স্যার। রাজ্যপাল এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হালকা মেকআপ অ্যালাউ করেন। টিভিতে মুখটাই সব। টিভি-র মুখ রক্ষা করুন স্যার।

সরষের তেল ছাড়া আমি মুখে কিছু মাখি না।

এক দিন স্যার।

পাশের মন্ত্রী বললেন, আমি কী রকম লক্ষ্মী ছেলে দেখুন, সব

মেখেছি। মুখের চেহারাই পালটে গেছে। উঃ মুখে যে কত ময়লাই জমে। আমাদের মুখ নয় তো মুখোশ। আজ রিয়েল চেহারাটা জনসাধারণ দেখবে।

পরিচালক আমাদের মন্ত্রীকে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার।

মন্ত্রী মহোদয় এবার একটু টসকালেন, ঠিক আছে, সামান্য একটু লাগাও। আমার সিসটেমটা একটু অন্যরকম, নেচারস ন্যাচারাল বিইং। বিয়ের সময় মুখে একটু স্নো মেখেছিলুম, সারা রাত ঘেমে মরি।

এখানে ঘাম হবে না স্যার। স্টুডিওতে শীতে কেঁপে মরতে হয়।

নাও, নাও, লাগাও লাগাও।

মেকআপ ম্যান মন্ত্রীর মুখমণ্ডলে যথেচ্ছাচার শুরু করে দিলেন। সেই গল্পে পড়েছিলুম, রাজা একজনের কাছে মাথা নিচু করেন, তিনি হলেন ক্ষৌরকার। টিসু পেপারি দিয়ে মুখ ঘষা হচ্ছে। তেল কালিতে কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে। ক্রিম আর পাউডার মাখিয়ে যখন তাঁকে ক্যামেরার উপযুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হল, তখন তিনি নিজের মুখ দেখে আনন্দে আটখানা! এত রূপ ছিল কোথায়। কলকাতার পলিউশনে চাপা ছিল।

আয়নায় মুখ দেখছেন আর বলছেন, রোজ একটু করে মাখলে বেশ হয়। আহা, এ-মুখ বউকে যদি একবার দেখাতে পারতুম।

মেকআপের ভদ্রলোক বললেন, এই তো তৈরি করে দিলুম। সাবধানে নিয়ে যান। কাল সকাল পর্যন্ত ঠিক থাকবে।

অনুষ্ঠান পরিচালক বললেন, পাঞ্জাবিটা স্যার পালটালে বেশ হত। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি দিচ্ছি, দয়া করে পরুন।

আপনার ওই অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না, ভেরি ভেরি সরি। আমি বাউল নই, মন্ত্রী।

সাদায় স্যার ভূতের মত দেখাবে।

শাট আপ।

আচ্ছা, আচ্ছা, অ্যাজ ইউ লাইক।

সদলে দুই মন্ত্রী স্টুডিওতে চলে গেলেন। আমরা ফেউয়ের দল। বাইরের অফিসঘরে বসে রইলুম। সামনে একটা মনিটার।

পর্দায় ভেতরের খেলা দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রী রাগ রাগ মুখে গাঁট হয়ে বসে আছেন। আমার সেই জ্ঞানগর্ভ লেখাটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজ দেখে কেরামতি চলবে না। জীবন্ত আলোচনা। পশ্চিম বাংলার উন্নয়নে সোচ্চার চিন্তা। কোথা থেকে এক মডারেটার ধরে আনা হয়েছে। তিনি খুব কেতা মেরে একপাশে কেতরে বসে আছেন। কালো কার বাঁধা একটি করে স্পিকার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জামার তলায়, বক্ষসংলগ্ন হয়ে আছে।

ফ্লোর ম্যানেজার অনুষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন সংকেত বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কলা দেখালে, স্টার্ট। চেটো বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে তুললে স্টপ। আঙুল দিয়ে লাট্টু ঘোরালে, আলোচনা গুটিয়ে আনুন। সময় শেষ হয়ে আসছে।

মডারেটার তেড়েফুঁড়ে ভূমিকা করলেন। পশ্চিমবাংলার অর্থ-নীতি আর লজ্জাবতী বধূর মত মুখ ঢেকে নেই। আধুনিকার অসংকোচ পদক্ষেপে, গ্রাম থেকে জেলা শহরে, শহর থেকে রাজ-ধানীতে, রাজধানী থেকে বিদেশে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদন বেড়েছে, চারিদিকে হই হই পড়ে গেছে।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় মন্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কেমন করে আপনারা এই অসাধ্য সাধন করেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

আমাদের মন্ত্রী সরোষে বললেন, ইনসালটিং। আগে আমাকে প্রশ্ন না করলে, আমি ওয়াক আউট করব।

অপর মন্ত্রী ব্যঙ্গের গলায় বললেন, ওয়াক আউট করাটা অপো-জিশানদের একচেটে কাজ। নিজের ভূমিকা ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, বসে আছেন ট্রেজারি বেঞ্চে। আপনার অবশ্য দোষ নেই, কোয়ালিশানে না এলে, চিরকালই আপনাকে অপোজিশন বেঞ্চে বসতে হত।

ফ্লোর ম্যানেজার প্রোডিউসার দু'জনেই ধেই ধেই করে নাচছেন, স্টপ স্টপ।

আমাদের মন্ত্রী আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। সদর্পে ওয়াক আউটের জন্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় মন্ত্রী ট্রেজারি বেঞ্চে বসে চিৎকার

করছেন—শেম শেম।

অনুষ্ঠান পরিচালক বিব্রত মুখে বললেন, স্যার, এ অ্যাসেমব্লি নয়, টিভি-স্টুডিও।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, আমার একটা প্রেসটিজ আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, আমারও আছে।

আপনার দপ্তর ছোট, বনবিভাগ, আমার দপ্তর শিল্প।

বন বিভাগ ছোট ? হাসালেন দাদা। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যভূমির মাপ জানা আছে মন্ত্রী মহোদয় ?

পশ্চিমবাংলার ছোট বড় শিল্পের সংখ্যা কি আপনার জানা আছে ?

আরে মশাই, শিল্প বড় না অরণ্য বড়! কাঁচা মাল না দিলে আপনার শিল্প তো লাটে উঠবে।

পরিচালক বললেন, ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে স্যার।

আমাদের মন্ত্রী এক দাবড়ানি দিলেন, চুপ করুন আপনি। আমাদের ব্যাপার, আমাদের ফয়সালা করতে দিন।

তা হলে, আপনাদের এই তরজাটাই রেকর্ড করে নি। জমবে ভাল।

স্টেশান ডিরেকটার ছুটে এলেন। এ সমস্যার কী সমাধান। এ তো নির্বাচনের আগে, আসন ভাগাভাগির চেয়েও জটিল ব্যাপার।

ফ্লোর ম্যানেজার বললেন, কোরাসে উত্তর দিলে কেমন হয় ? সমবেত সংগীত যখন হয় সমবেত প্রশ্নোত্তর কেন হবে না ?

যেমন ধরুন, প্রশ্ন যদি হয়, পশ্চিমবাংলার এই অভূতপূর্ব উন্নতি কীভাবে সম্ভব হল ? ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিলেন, আমাদের সুশাসনে।

আমাদের মন্ত্রী কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ইয়ারকি হচ্ছে ? মন্ত্রীর সঙ্গে ইয়ারকি। জান তোমার চাকরি খেয়ে ফেলতে পারি!

পারেন স্যার, তবে বদহজম হবে।

অ্যাঁ কী বললে ?

স্টেশান ডিরেকটার বললেন, আচ্ছা ফাঁপরে পড়া গেল দেখছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রী পা নাচাতে নাচাতে বললেন, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, মধু তো আমার অরণ্যসম্পদ।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, তোমার বাপের সম্পদ।

অবজেকসান, অবজেকসান, মাননীয় স্পিকার, ও, এটা তো আবার অ্যাসেমব্লি নয়।

আমাদের মন্ত্রী নিজেকে সংযত করে বললেন, মধু দু'রকমের, এক, বনের মধু, সেটা মধুই নয়, তার ওপর আমার কোনও কনট্রোল নেই। দুই, চাষের মধু, সেটাই হল আসল মধু, গ্রামীণ শিল্পের মধু। ইচ্ছে করলে আমি উৎপাদন বাড়াতে পারি, আমি উৎপাদন কমাতে পারি।

ওঃ রাজা ক্যানিউট রে। দিস ফার অ্যান্ড নো ফারদার।

শুনলেন! আপনারা শুনলেন!

ডিরেকটার বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাড়ে হাড়ে টের পেলুম, বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াবার ক্ষমতা নেই।

দুই মন্ত্রী কোরাসে বললেন, কে বাঘ, কে গরু।

কোরাস ছেড়ে ইনি বলেন আমি বাঘ, উনি বললেন আমি বাঘ।

ইনি বলেন ওটা গরু, উনি বলেন ওটা গরু।

ডিরেকটার বললেন, আপনারা দুজনেই বাঘ, আর একই জঙ্গলে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। প্রোগ্রাম ক্যানসেলড।

ছয়

ঘাড় চুলকে, মুখ কাঁচুমাচু করে একদিন বলেই ফেললুম, স্যার আমার একটা প্রমোশান দীর্ঘ দিন দরকচা মেরে রয়েছে, পাকছে না, ফাটছে না, বসছে না। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

মন্ত্রী মহোদয় সবে খানাপিনা সেরে এসেছেন। মেজাজে বসন্তের বাতাস বইছে, কোকিল ডাকছে কুহু সুরে। দাঁতখোঁচাটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়ে বেশ ভাবুক ভাবুক মুখে বললেন, কোন্ হারামজাদা চেপে রেখেছে?

জানি না স্যার।

অপদার্থ। জেনে আমাকে জানাও। কমপ্রেস আর তোকমারি

একসঙ্গে লাগাতে হবে। তোমার তিন হাজার টাকা মাইনে হওয়া উচিত।

বুকটা কেমন করে উঠল। তিন হাজার মাইনে হলে রোজ মাছ খাব। চারা নয়, বেশ পাকা পোনা। সকাল বিকেল। সপ্তাহে তিন দিন মুরগী চালাবো। রোজ সকালে হাফবয়েল, পুরু মাখন দিয়ে দুপিস রুটি। রাতের দিকে বাড়িতেই একটু ঢুকু ঢুকু। গালগলায় তিনথাক মাংস নেমে যাবে! আর ইডেনে আগাছার জঙ্গলে বসে যে ইভটিকে গত তিন বছর ধরে বলে আসছি—একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর, সবুরে কাবুলী মেওয়া ফলে, তাকে টেনে তুলে আনব ঘরে। সেই অভাগীর জন্যে কম রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি! কাকে ব্রহ্মতালুতে বড় বাইরে করে করে, উত্তাপে চাকতি মাপের একটা টাকই তৈরি করে দিলে। সেদিন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বসে দুজনে হাতে হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি আর তারা গুনছি, এমন সময় কে একজন প্রেমঘাতক ঝোপের ওপাশে ছোট বাইরে করতে লাগল। কী তার তেজ? আখের রস, কি বীয়ার খাওয়া মাল। পিঠ ফুঁড়ে যাচ্ছে। ওঠার উপায় নেই। এমনভাবে বসেছিলুম দু'জনে আইনের ভাষায় যাকে বলে কমপ্রোমাইজিং পজিশান। কলকাতার মানুষের তো কোনও আক্কেল নেই। হত হাইড পার্ক! এ শহরে হাইডিং হাইডিং চলে সব, কেবল হাইডপার্কটা নেই। সেই প্রথম শীতের ভূতঘাটে গিয়ে ছোটবাইরে স্নাত প্রেম-কান্তিকে গঙ্গাবারি ধৌত করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে প্রশ্নবাণ, ভিজে এলি কোথা থেকে? প্রেমে আর রণে অনৃত ভাষণ অ্যালাউড। অম্লান বদনে বলতে হল, রিটারনিং ফ্রম বার্নিং ঘাট। এক সহকর্মী হঠাৎ পটল তুললেন। এই তো মানুষের জীবন মা। এই আছে এই নেই। মা অমনি কোথা থেকে একমুঠো নিমপাতা এনে বললেন, চিবিয়ে খা। রাত সাড়ে দশটার সময় বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমানন্দে নিমপাতা চর্বণ। অহো, এই বদান্য মন্ত্রী মহোদয়ের জাঁকে সেই প্রেম এবার কার্বাইড পাকা হবে। রাতে বাড়ি ফিরে আর নিমপাতা নয়, স্ত্রীর সেবা। লং লিভ এই গভরমেন্ট।

তা হলে ?

বলুন স্যার ?

খুশি তো। প্রমোশন হোক না হোক, তোমার ইভ্যালুয়েশন হয়ে গেল। তিন হাজার। তিন হাজারের এক পয়সাও কম নয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়ো আনন্দ হচ্ছে।

তবে আর কী! এই আনন্দেই একটা কাজ করে ফেল।

বলুন স্যার। আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি। আই লাভ ইউ। আর একটু হলেই ডার্লিং শব্দটা বেরিয়ে পড়ছিল। কী দুঃসাহস আমার!

মন্ত্রী মহোদয় অবাক হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অবাক করলে ছোকরা। আমাকে তুমি প্রেম নিবেদন করছ। আমাকে সবাই দুর্বাসা বলে। কত কি যে ভস্ম করেছি। আচ্ছা শোনো, একটু গোবরের খবর নাও তো।

গোবর স্যার ?

হ্যাঁ স্যার। দুটো জেলা আগে ধর। হুগলী আর চব্বিশ পরগনা। দুটো জেলায় কত গোবর উৎপাদন হয়।

গোবর আবার উৎপাদন হয় নাকি! সে তো গরুতে ঘ্যাস ঘ্যাস করে নাদে।

গর্দভ। সেটাও একটা উৎপাদন। তুমি করবে কি, লেটেস্ট সেনসাস থেকে ক্যাটল পপুলেশানটি বের করবে। করে, একটা স্যাম্পল সারভে করবে।

সে আবার কী জিনিস ?

তুমি প্রত্যেক জেলায় টেন পারসেন্ট গরুকে মিট করবে। গরুর মালিককে জিজ্ঞেস করবে, আপনার গরু দিনে কতবার মলত্যাগ করে। এক এক গরুর, এক এক হ্যাবিট। দেখবে মানুষের মতই। আমরা যেমন।

আপনার গরু আছে স্যার ?

তুমি একটা গরু। আমি মানে আমি। আমরা সকালে একবার, রাত্রে একবার। তোমার কবার ?

আজ্ঞে, আমার বারবার।

তোমার অ্যামিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস আছে।

ওই স্যার তিন হাজার টাকা হলে রোজ চিকেন ব্রথ খাব, ঠিক হয়ে যাবে। হবে তো স্যার!

ও, সিওর। তা গরুরও ওই রকম। তুমি একটা অ্যাভারেজ করবে। অ্যাভারেজ এল হয়ত ওই জেলার গরু দিনে চারবার করে। এইবার তুমি কী করবে?

কী স্যার?

যে কোনও একটা গরু, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান গরুর পেছু নেবে। অ্যাজ ইফ তুমি একটা ষাঁড়। ফলো করতে করতে, ফলো করতে করতে, যেই সে ঘ্যাস করে করল, অমনি তুমি স্যাম্পলটা কালেক্ট করে নিলে।

ঘেন্না করবে স্যার।

অ্যাঃ ঘেন্না করবে। ওরে আমার ঘুঁটেকুড়ুনির ব্যাটা।

মন্ত্রী মুখ ভেঙালেন। তৎক্ষণাৎ রইল তোর চাকরি বলে উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল। স্রেফ তিন হাজার টাকার গাজরের লোভে জেনুইন গাধার মত হাসি হাসি মুখে বসে রইলুম।

পশ্চিমবাংলার সব বাঙালী মেয়েই এক সময় ঘুঁটে দিত। ঘুঁটে না দিলে শাশুড়িরা গালে নিমঠোনা মারত।

নিমঠোনা কী জিনিস! জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে।

আমার মা স্যার ঘুঁটে দিতেন না।

তাঁর মা দিতেন। যত অতীতে পেছবে, দেখবে গরু আর ভড়ভড়ে গোবর। গোবরেই না আমাদের মত পদ্ম ফুটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার ঠাকুর্দা মৃত্যুর আগে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তোমরা কি জমিদার ছিলে?

না স্যার, জমিদাররা কি চাকরি করে!

আমরা ছিলুম। আমার ঠাকুর্দা সঙ্গে গোবরের গুলি নিয়ে ঘুরতেন। এ পকেটে গোবরের গুলি, ও পকেটে আফিমের গুলি। একটা করে পাপ কাজ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একগুলি গোবর একগুলি আফিম মুখে পোস্ট করতেন। এখন তিনি স্বর্গে

ডোলিভারি হয়ে গেছেন! তোমার মাথায় কী আছে?

আজ্ঞে বুদ্ধি।

তুমি বুঝি তাই মনে কর? গোবর আছে, গোবর।

না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। (না বললেই তিন হাজারের স্বপ্ন ফুল)।

আচ্ছা, গোবরটা তুমি কালেক্ট করলে। করলে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার ওজন কর। ধরো দু'কেজি হল। তা হলে কী হল, টোটাল গরু ইনটু টু ইজ ইকোয়াল টু টোটাল অ্যাভেলেবিলিটি অফ কাউডাং ইন দি ডিসট্রিক্ট। ক্লিয়ার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লিয়ার।

তা হলে, বেরিয়ে পড়।

আজই স্যার?

না, কাল থেকে তোমাকে সাতদিন সময় দেওয়া হল।

গোবর কী হবে স্যার? ঘুঁটে ইনডাস্ট্রি!

তোমার মাথা! গোবর গ্যাস তৈরি হবে। সেই গ্যাসে গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, রান্না হবে। মাঠে সার হয়ে ফিরে যাবার আগে, টন টন গোবরের কাছ থেকে আমরা গ্যাসটুকু আদায় করে নোব। একে বলে প্ল্যানিং। পশ্চিমবাংলাকে দেখিয়ে দোব, আমরা কী করতে পারি, আর কী পারি না। এক মাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত ছটা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট আমি বসাবোই। সেন্টার প্রচুর টাকা স্যাংসান করেছে। সে টাকা ফিরে না যায়। দেশের মানুষ কাজ চায়, কাজ। শুধু গলাবাজিতে কিছু হয় না।

মন্ত্রী মহোদয় ফোন তুলে বললেন, কানাইকে দাও।

ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, হিসেবে কোনও কারচুপি কোর না, তাহলেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাবে। এ ব্যাপারে তোমাকে ডি এম-রা সাহায্য করবেন।

ফোন বেজে উঠল।

কে কানাই? আমার ছকটা দেখলে! দেখেছো? কী বললে, মঙ্গল। হ্যাঁ হ্যাঁ মঙ্গল অমঙ্গল করবে? রাসকেল। না না, তুমি

রাসকেল নও, দ্যাট ব্লাডি মঙ্গল। তা ও ব্যাটাকে একটু ঠাণ্ডা কর! গাড়ি চাপা বন্ধ করব? এবার তুমি রাসকেল। ইলেকসান এসে গেল। এখন তো ঘুরতেই হবে। লাল? হ্যাঁ হ্যাঁ লাল। না, একটা লাল কলম ছাড়া আর কিছু নাই। ইডিয়েট! লাল ল্যাঙোট পরতে যাব কোন দুঃখে! আমি কি কুস্তিগির। না, তোমার বউদির ঠোঁটে লাল নেই। ঘরে? দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ চেয়ারের গদি লাল বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি ছিঁড়ে ফর্দাফাই করে দিচ্ছি। জানি না কোন রাসকেলের কাজ, সে ব্যাটার চাকরি খাব। কী বললে, খাওয়া দাওয়া কম করব! ইডিয়েট! আমি চাকরি খাবার কথা বলছি। চাকরি গেলে গলায় কাঁটা ফুটবে কেন? এ কি চারা পোনা ভেবেছো? না না, ইলেকসান পর্যন্ত বোনলেস ভেটকি আর চিকেনেই চালিয়ে নোব। ফিরে আসছি তো? আসছি। তোমার মুখে ফুলচন্দন। কী বললে, মারা না গেলে মৃত্যুর কথা আসছে কেন? আজই থরো চেক আপ, অ্যাকসিডেন্ট! মরেছে। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, ও গাড়ি! গেরুয়া রঙের গাড়ি পাব কোথায়? পলা? হ্যাঁ হ্যাঁ পলা তো আমার আঙুলেই আছে। কত বড়? একটা বড় সাইজের সুপুরির মত? ও, রাস্তায় বেরোবার সময় প্রথমে ডান পা ফেলব? তাই ফেলবো। যদি মনে থাকে।

মন্ত্রী মহোদয় ফোন নামিয়ে রাখলেন।

তাহলে স্যার সাতদিন আপনার কাজে আমাকে যাতে ছাড়া হয় অফিসকে একটু বলে দেবেন।

কিইই?

মন্ত্রীর বিস্ফোরণ।

আমার কাজে অফিসের অনুমতি? আমি বড় না অফিস বড়?

আজ্ঞে আপনি।

যদি প্রশ্ন করতেন, আমি বড় না ঈশ্বর বড়? আমি বলতুম আপনি। সামান্য তেলে যদি তিন হাজারের মাচায় একবার উঠতে পারি, আমাকে আর পায় কে? সেই সিগারেটের বিজ্ঞাপন— মিনিস্টার মে কাম, মিনিস্টার মে গো, আমলাজ উইল গো ফর এভার।

মন্ত্রী বললেন, তুমি যাবে, যদি কেউ কিছু বলে কান ধরে আমার কাছে টেনে আনবে। যাও। আভি নিকালো।

দুর্গা, শ্রীহরি বলে বাঘের সামনে থেকে সরে পড়া গেল। বেশি কচলালে লেবু তেতো হয়ে যায়। বেশি তেলে হড়হড়ে। হড়কে বেরিয়ে যাবে। সাপ নিয়ে খেলা। ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে। এই গোবরেই না গেঁজিয়ে যাই। প্রকৃতই যদি ষাঁড় হতে পারতুম, তা হলে গরুর খবর আমার চেয়ে, কে আর ভাল জানত? আহা মানব সন্তান না হয়ে যদি কোন গোমাতার গর্ভে একটি এঁড়ে হয়ে জন্মাতুম!

সাত

হুগলী এক বিশাল জেলা। গরু-সমীক্ষায় এর কোন অংশে ল্যান্ড করব ভেবেই পেলুম না। মাথায় ধরব, না পায়ে ধরব, না হাতে ধরব! এত বড় একটা কাজ! ধান নয়, গম নয়, গোবরের প্রাপকতা?

বিমল বলেছিল, গরু না হলে কেউ গোবরের কথা এত ভাবে! পাড়ার একটা গরু ধর। পেটে গোটাকতক ঘুসি মার। মাল অটোমেটিক পড়বে। তাকিয়ে দেখ। চোখের দেখায় ওজন পেয়ে যাবে।

গোবর সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই নেই রে। হিসেবে সামান্য ভুল হলেই আমার বারোটা বেজে যাবে।

তা হলে মর।

মরতে হলে ডি এম-এর কাছেই মরা ভাল। সকাল এগারোটার সময়ে ডি এম-এর দপ্তরে হাজির। মানুষটি ভাল। ভেবেছিলুম খ্যাঁক করে উঠবেন। না, বেশ হেসে হেসেই বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে, এ কী গেরো বলুন তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। গোবর যে এত মূল্যবান কে জানত! আপনি আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?

কোনও ভাবেই নয়। সামনে নির্বাচন, আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই। যা পারেন, নিজে করুন। উইশ ইউ গুড লাক।

কী ভাবে কী করা যায়! মন্ত্রী বলেছেন টেন পারসেন্ট গরুর গোবর চেক করে একটা অ্যাভারেজ হবে।

আপনি যেমন, আপনার মন্ত্রীও তেমন। হতেছে পাগলের মেলা খ্যাপাতে খেপিতে মিলে। আমরা মরছি আমাদের জ্বালায়। রোজ তিন চারটে করে পলিটিক্যাল লাঠালাঠি হচ্ছে। মাঠে-ঘাটে মানুষের লাশ গড়াচ্ছে, সেই সময় আপনি এলেন গোবরগণেশ হয়ে। সাত-সকালে আর জ্বালাবেন না তো!

কানে আঙুল দিয়ে বসেছিলুম। পতি নিন্দা শোনাও পাপ। আহা, ওই হল আর কি। তুমি হো পিতা, তুমি হো মাতা, সখা তুমি হো, কী যেন একটা গান আছে এই রকম। জেলা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। একেবারে পণ্ডশ্রম হল তা বলব না। এইটুকু বোঝা গেল, গণ্ডায় আণ্ডা মেলালে জেলা অফিস ক্যাঁক করে চেপে ধরবে না।

দোকানে চা খেতে খেতে মাথায় একটা মগজের ঢেউ খেলে গেল। শ্রীরামপুরের কাছে আমার এক বন্ধু আছে। জমিদারের ছেলে। সেই সুসিতের কাছে গেলে সমস্যার হয়ত সমাধান হবে। ওদের গোটা কতক গরু আছে। সুসিত কি এই সময়ে বাড়িতে থাকবে! দেখা যাক চেষ্টা করে।

সুসিত বাড়িতেই ছিল। সবে চান সেরেছে। খেতে বসবে আর কি! একটা পাঁচের ট্রেন ধরে কলকাতায় আসবে। ব্যবসা করে। স্বাধীন মানুষ। আমাদের মত গোলাম নয়।

সুসিত বললে, আমাদের তিনটে গরু আছে তবে তারা তো সব জার্সি।

সে আবার কী? জার্সি তো ফুটবল খেলোয়াড়রা পরে।

আরে, না রে বাবা, জার্সি হল বিলিতি গরু। এক একবারে পনের কেজি দুধ নামায়।

তা নামাক। প্রাতঃকৃত্য করে তো।

তা করে। তবে কোয়ানটিটি দিশি গরুর মত হবে না। সায়েব

গরু তো, সায়েবের মত সিসটেম। একটু কম করে।

তুই ভাই আমাকে বাঁচা। একটু করতে বল, ওজনটা দেখতে হবে। তারপর একটু এদিক সেদিক করে নিলেই বিলিতি গোবর দিশি গোবর হয়ে যাবে।

তা হলে অপেক্ষা কর, করলেই আমি খবর পাঠাতে বলছি।

তোর দাঁড়িপাল্লা আছে?

সে ব্যবস্থা হবে'খন।

সুসিতের কলকাতায় যাবার বারোটা বেজে গেল। দু'জনে ভরপেট খেয়ে বৈঠকখানায় বসে আছি। কখন গরু দয়া করে একটু করবে। বেলা প্রায় তিনটে বাজল। বিকেলের চা এসে গেল।

কী রে সুসিত, তোর গরুর কী হল?

দাঁড়া দেখে আসি।

সুসিত ফিরে এসে বললে, গরুর বোধহয় কনসটিপেশান হয়েছে মাইরি।

সে কী রে!

খাচ্ছে কিন্তু ছাড়ছে না!

তা হলে দুধে কনসটিপেশান বল?

না তা নয়, দুধ তো গ্ল্যান্ডের ব্যাপার।

তা হলে কী হবে?

তোর তো সাতদিন সময় আছে। আজ বরং সন্ধ্যার দিকে জোলাপ খাইয়ে রাখি। তুই কাল সকালের দিকে আয়।

জোলাপের দাস্তে তো হিসেব মিলবে না রে?

আরে বিলিতি, জোলাপ খেয়ে যা করবে, দিশি তা এমনি করবে।

হঠাৎ ভেতর বাড়িতে উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল, করেছে করেছে। শিশু-কণ্ঠের চিৎকার, মেজকা, গরু পায়খানা করেছে, শিগগির এসো, শিগগির এসো।

আমরা দু'জনে শেষ চুমুকের চা ফেলে দৌড়লুম। সুসিতের গোয়ালে ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। তিনটে অদ্ভুত চেহারার জন্তু বাঁধা রয়েছে।

সুসিত, এরা কি সত্যিই গরু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সায়েব গরু। দেখছিস না, গোয়ালে পাখা ফিট করেছি।

তিনটে গরুর মেমসায়েবের মত নাম, শেলি, রুবি, লিলি। শেলি নেদেছে। একপাশে পোয়াটাক মাল পড়ে আছে।

সুসিতের মা বললেন এ গরুর বাবা একটাই দোষ, একেবারে বিলিতি স্বভাব। দুধ বেশি, গোবর কম। তেমন ঘুঁটে হয় না।

তা মাসিমা, দিশি গরু একবারে কতটা করে দেয় ?

কী, দুধ ?

আজ্ঞে না গোবর।

তা ধরো তিন চার কেজি তো হবেই।

দিনে কবার ?

সে বাবা এক এক গরুর এক এক স্বভাব। আমার এই মেজো ছেলে সুসিত, দিনে সাত-আটবার—সুসিত বললে, আঃ, মা, হচ্ছে গরুর কথা, তুমি আমাকে ধরে টানাটানি করছ কেন ?

টানাটানি করব কেন ? আমি বলছি, মানুষের মতই কোনও গরু সকাল সন্ধে দু'বার ঠিক তোর বাবার মত। কোনও গরু তোর মত বারবার।

ল অফ অ্যাভারেজ সাধে শিখেছি। যার কল্যাণে টাটা বিড়লার রোজগার আমাদের ঘাড়ে চেপে পারক্যাপিটা ইনকাম হয়ে যায়। ল অফ অ্যাভারেজে সুসিতের বৈঠকখানায় বসে বেরুল, গরু দিনে চারবার করে, একেকবারে তিন কেজি। এইবার সেনসাস রিপোর্ট দেখে গরুর সংখ্যা বের করে বারো গুন। যদি হাজার দশেক গরু থাকে, দশ হাজার ইনটু বারো। বাপস, হুগলী তো গোবরে নেবড়ে আছে রে বাবা !

সুসিতের ওখান থেকে বেরোবার পর বেশ খুশি খুশি লাগল। একটা ফর্মুলা আয়ত্তে এলে অংক কষা সহজ হয়ে যায়। পরীক্ষায় ফেল করার ভয় থাকে না। এখন আমি সব জেলার গোবর সেকেন্ডে বের করে দিতে পারি। গরু গুণিতক বারো সমান সেই জেলার গোবর। আর আমাকে পায় কে ! আ-যাও মেরা মন্ত্রী ! তিন হাজার আমার হাতের মুঠোয়।

শ্রীরামপুরের বাজারে ফার্স্টক্লাস আম উঠেছে। পেয়ারাফুলির দেশ। পেয়ারাফুলি ছাড়াও, তাজা ল্যাংড়ার ছড়াছড়ি। তিন হাজার তো হবেই। খোদ মন্ত্রী হামারা হাত কা মুঠ্‌ঠিমে। সারা পশ্চিমবাংলার গোবরের হিসেব আমার বুক পকেটে। আয় শালা, লড়ে যাই!

বেশ তাজা ল্যাংড়া নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গৃহপ্রবেশ। সন্ধে হয়ে গেছে। বাতাসে বসন্ত ছেড়েছে। যদিও এখন বসন্ত নয়, বর্ষা এলো বলে। মেজাজ ভীষণ খুশি খুশি। পুরনো দেয়ালের সব প্ল্যাস্টার ফেলে দোব। নতুন প্ল্যাস্টারে সবুজ ডিসটেম্পার বিজলীর আলোয় মিটি-মিটি হাসবে। নহবতের সুরে রাঙা শাড়ি পরে তিনি আসবেন। তিন হাজার। কিন্তু কোন পোস্টে তিন হাজার মাইনে হবে! খোদ বড়-কর্তারও তো তিনহাজার হয় না। হয় কি? কে জানে বাবা! সে মন্ত্রী বুঝবেন। দ্যাটস নট মাই হেডেক।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, রাত প্রায় এগারোটা। গরমের রাত, পাড়া তাই সরগরম। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। খাবার ঘরে এখনও হল্লা চলেছে। মা আছেন, আমার বোনটা আছে। দেখে এসেছি জানালায় চেন দিয়ে বাঁধা আছে আমাদের মাস তিনেক বয়সের কুকুর, টম। আমার বোন কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। অ্যালসেসিয়ান বলে এনেছিল, নেড়িও হতে পারে।

ওপাড়ায় খুব একটা মজা চলেছে। মাঝে মাঝে হাসিতে সব ভেঙে পড়ছে। তিন হাজার এখনও হয়নি। তাইতেই বাড়িতে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। হলে কী হবে! সকাল সন্ধে সানাই বাজবে। হঠাৎ আমার বোন ডাকল, দেখবি আয়, দেখবি আয়।

দেখার মতই ব্যাপার!

ব্যাটা কুকুর। জন্মে থেকে শুধু ছাঁটই খেয়ে আসছে। সেই মুখে পড়েছে ল্যাংড়া আমের টুকরো। তিন টুকরো খেয়ে সামনে থাবা গেড়ে বসে কান খাড়া করে জিব চোকাচ্ছে। আমার বোন তারিয়ে তারিয়ে আঁটি চুষছে। চেনে বাঁধা তাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। ভুক্‌ ভুক্‌ করছে আর নেচে নেচে উঠছে। জার্মান সায়েব আমের জন্যে পাগল।

আমার বোন আঁটিটা ছুঁড়ে দিল।

কুকুর আঁটিটা মুখ দিয়ে ধরে আর আঁটি পিছলে চলে যায় নাগালের বাইরে।

দাদা, ঠেলে দে, ঠেলে দে।

একবার দিলুম। আঁটি আবার পিছলে চলে এল।

আবার দিলুম। আবার চলে এল।

আঁটি তো হাড় নয়। পিচ্ছিল জিনিস। কুকুরটার অবস্থা ঠিক আমার প্রমোশনের মত। নাগালে আসে, আবার পিছলে চলে যায়। টম আমার মতই ক্ষেপে উঠেছে।

বারতিনেক হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়েছি। কুকুরটা ইতিমধ্যেই বদ মেজাজের জন্যে বিখ্যাত। যা করছি দূরে থেকে। চতুর্থ বারে, কীভাবে যেন আমার ডান হাতের চেটোর উলটো পিঠটা তার কামড়ের সীমানায় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁকু।

ধরেই ছেড়ে দিল। দিলে কী হবে, ওইতেই যা হবার তাই হয়ে গেল। খানিকটা মাংস কুদলে ওপর দিকে ঠেলে উঠল। হাতের ওপর দিয়ে যেন পাওয়ার টিলার চলে গেল। ওদিকে ল্যাংড়ার চাকলা, এদিক হাতের চাকলা।

যে কুকুরকে আম খাওয়ানোর জন্যে সবাই ব্যস্ত হচ্ছিল, তাকে এবার জুতো খাওয়াবার জন্যে সবাই তেড়ে উঠল। সে বেচারা বুঝেছে, কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। যে হাত তিন হাজার আনবে সেই হাতে কামড়! কোণের দিকে ভয়ে বসে আছে।

এদিকে আমার পুরো হাত চড়চড় করে ফুলছে।

মেরে কী হবে। অন্যায় করে ফেলেছে, অবলা জীব। এত রাতে ডাক্তার পাই কোথায়।

একটিমাত্র ডিসপেনসারি খোলা ছিল। তেমন নামডাকঅলা কেউ নয়! ঠেকা দেনেঅলা এল এম এফ। পরে এম বি হয়েছেন। বসে বসে সারাদিনের হিসেব মেলাচ্ছিলেন। কম্পাউন্ডার ঝাঁপ বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত।

আমি ঢুকে বসেছি সবে, ডাক্তারবাবু, আমাকে কুকুরে—

দুটো হাত ওপর দিকে তুলে ডাক্তার জাম্প করলেন, ওরে বাপরে,

আমি কুকুর নই, ও এখানে হবে না, এখানে হবে না, হাসপাতালে যান, হাসপাতালে যান।

ক্যাশ বাক্স ছেড়ে ডাক্তারবাবু এক লাফে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। এমন আতঙ্কের কী কারণ বোঝা গেল না। কুকুরের কামড় খাওয়া মানুষ কি খ্যাপা কুকুর! জলাতঙ্ক রোগ ছড়াতে এসেছি! কম্পাউন্ডারবাবুকে মাস্তানের গলায় বললুম, যা বলছি, তাই করুন। বেশ খানিকটা তুলো বের করুন। ডাক্তারবাবুর চেয়ে সাহসী মানুষ বলেই মনে হল।

নিন, চেপে ধরুন। বেশ করে চাপ দিয়ে ফোলাটাকে থেবড়ে দিন।

বিজ বিজ করে শব্দ হচ্ছে। ব্যাটা টম হাতটাকে বেশ জখম করে দিয়েছে।

নিন এবার কার্বলিক ঢালুন। আরে মশাই যন্ত্রণা আমার হবে, আপনি অত কাতর হচ্ছেন কেন? নিন, এবার যে কোনও একটা মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিন।

কম্পাউন্ডারবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, কাল থেকেই তলপেটে চোদ্দটা ইনজেকসান নেবার ব্যবস্থা করুন। জলাতঙ্ক হলে আর বাঁচবেন না।

কালকের কথা কালকে, এখন একটু টেটভ্যাক ছাড়ুন! আর গোটাকতক পেনিসিলিন ট্যাবলেট দিন।

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট! কেন মরতে তিন হাজার টাকার আনন্দে ল্যাংড়া কিনে মরেছিলুম।

সকালেই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের কাছে দৌড়লুম। তিনি আবার আর এক কাঠি ওপরে যান। টিপেটুপে বললেন, এঃ, গ্যাস-গ্যাংগ্রীন হয়ে গেছে হে। হাতটা না অ্যামপুট করতে হয়।

সে কী!

তাই তো মনে হচ্ছে।

আমি যে লিখে খাই।

বাঁ হাতে অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসে কী না হয়! অনেকে পা দিয়ে লেখে।

তলপেটে ফুঁড়তে হবে?

বাড়ির কুকুর তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে প্রয়োজন হবে না।

এরপর যিনিই দেখেন, তিনিই প্রশ্ন করেন, হাতে আবার কী হল?

কুকুর কামড়েছে।

সর্বনাশ! ইনজেকসান নিয়েছ?

দরকার হবে না! বাড়ির কুকুর।

ওই আনন্দেই মর। কে বলেছে তোমাকে, নিতে হবে না?

আমাদের ডাক্তারবাবু।

কিস্যু জানে না। মানুষমারা ডাক্তার। পাস্তুরে চলে যাও।

একজন আবার রাস্তার কলের পাশে জমা জল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী, আতঙ্ক হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আজ না হোক কাল হবে।

হঠাৎ পা মাড়িয়ে দিলেন, উঃ করে উঠলুম।

হঠাৎ পা মাড়ালেন!

না হে পরীক্ষা করে দেখলুম, কেঁউ কেঁউ কর কি না!

ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাত বুকের কাছে ঝুলছে। গ্যাংগ্রীন শুনেছি, গ্যাসগ্যাংগ্রীন কাকে বলে জানি না। এদিকে গোবরের রিপোর্ট একটা লিখতে হবে। চব্বিশ পরগনার ডি এমের সঙ্গেও একবার দেখা করবার দরকার। বাড়িটা অন্তত ছুঁয়ে রাখতে হবে।

বাসে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কী হল হে!

কুকুরে কামড়েছে শুনে বেশ যেন আনন্দ পেলেন। আমাকেও কামড়ে ছিল হে! ওয়ান্স আপন এ টাইম, আই ওয়াজ এ প্রাইভেট টিউটার—বলে শুরু করলেন। যে বাড়িতে পড়াতেন, সেই বাড়িতে একটা কুকুর ছিল। শুয়ে থাকত টেবিলের তলায়। একদিন চটি পরতে গিয়ে ন্যাজে পা লাগায়, ন্যাজের অপমানে খ্যাঁক করে কামড়ে দিলে। তারপর ভাই পাস্তুরে গিয়ে ইনজেকসন। এই এত বড়

সিরিঞ্জ। লাইনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। সামনের দিক থেকে এক একজন করে যাচ্ছেন, আর চিৎকার করে উঠছেন—বাবা রে।

বেয়নেট চার্জ শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যুদ্ধে হয়।

এই ইনজেকসানও দেওয়া হয় ওই কায়দায়। দু'হাতে সিরিঞ্জ বাগিয়ে, দূর থেকে ছুটে এসে তলপেটে ফাঁস। আমার সামনে আর মাত্র তিনজন। ভয়ে গা-হাত-পা কাঁপছে। এক-পা এক-পা করে লাইন থেকে সরছি। ইচ্ছে, পাশে সরে গিয়ে দে ছুট। পেছন থেকে একজন বললেন, ব্যাটা পালাচ্ছে! আর যায় কোথায়! সবাই মিলে জাপটে ধরে পেড়ে ফেললে। ওঁরা সকলেই ছিলেন ন্যাজকাটা শেয়াল। আমার ন্যাজটিও কাটিয়ে ছাড়লে? সে যে কী যন্ত্রণা! তা তুমি কবে নিচ্ছ?

আমি নোব না। কামড়েছে বাড়ির কুকুর।

নেবে না মানে! আমি এজেন্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চ বলছি, বাড়িরই হোক. আর রাস্তারই হোক ইনজেকশান ইজ এ মাস্ট।

কুকুরে চাটলেও আজকাল পাঁচটা নিতে বলে। কাটলে চোদ্দ, চাটলে পাঁচ। এই হল নববিধান।

তিনটে সিট আগের ভদ্রলোক এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলেন, বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, আজকাল আদর করে চেটে দিলেও নিতে হয়। আরে মশাই দুধ খেতে খেতে বাচ্চা ছেলে অসাবধানে কামড়ে দিলেও নিতে হয়।

দেখতে দেখতে সারা বাস আলোচনায় উত্তাল হয়ে উঠল। পেট ফোঁড়ার পক্ষে আর বিপোক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক। ড্রাইভার রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে পেছন ফিরে বললেন,

আরে মশাই, আমাকে একবার শেয়ালে কামড়েছিল। কিসু করিনি। এক গুণিন এসে পিঠে থালা বসিয়ে সব বিষ নামিয়ে দিলে।

ব্যাস, আলোচনা ঘুরে গেল, দৈব আর বিজ্ঞানের দিকে।

চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক বুকে ঝোলা হাত নিয়ে আমাকে

ঢুকতে দেখেই বললেন, ইলেকসানের আগে আমাকে আর জ্বালাবেন না। এ সব পেটি কেস লোক্যাল থানায় ডায়েরি করিয়ে রাখুন। কোন দলের? রুলিং না অপোজিসান?

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি এসেছি মন্ত্রীর গোবরের জন্যে।'

মন্ত্রীর আবার গোবর কী? গোবর তো গরুরই হয়। খাটালে খোঁজ করুন।

আজ্ঞে, মন্ত্রীর গোবর-গ্যাস?

ও, এমনি গ্যাস হচ্ছে না, এবার পাবলিককে গোবর-গ্যাস দেবেন! কত খেলাই জান প্রভু—সর্প হয়ে দংশ তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো। তা ডান হাতটা অমন করে বুকে ঝুলিয়েছিলেন কেন?

কুকুরে কামড়েছে।

যাক, রাজনৈতিক দংশন নয়। যে দংশনে আমরা অষ্টপ্রহর জ্বলছি। ইনজেকসান নিয়েছেন?

আজ্ঞে না, বাড়ির কুকুর তো।

বেশ করেছেন। আমার তিনটে কুকুর। কামড়ে কুমড়ে আমার শরীর ফর্দাফাঁই করে দিয়েছে। সর্ব অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। যেন বুয়োর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলুম।

অমন কুকুর পোষার দরকার কী স্যার?

এ আপনি কী বলছেন? এই যে ভোট দিয়ে যাদের ক্ষমতায় পাঠালেন তাঁরা যদি কামড়াতে আসেন, কিছু করার থাকে! যদ্দিন মেয়াদ তদ্দিন কামড়। কুকুরের কামড় সহ্য হয়ে গেছে বলে মানুষের কামড় আর তেমন অসহ্য লাগে না।

সকলে ভয় দেখাচ্ছেন, ইনজেকসান না নিলে জলাতঙ্ক হবে।

হ্যাঁ সব হবে। আমি ডি এম বলছি, নো ইনজেকসান।

তা হলে গোবর-স্যার।

আমাকে গোবর বানালেন? শুনুন, গোবর আছে, গোবর থাকবে, ওইসব অ্যাকাডেমিক একসারসাইজ ইউজলেস।

আমি চব্বিশ পরগণার একটা ফিগার বের করেছি।

আমাকে দিয়ে যান। লিখে রাখি। মন্ত্রী চাইলে সেইটাই সাপ্লাই করব।

যাক্, কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। ডি এম-কে বাজিয়ে গেলুম। এখন হাত নিয়ে দিনকতক পড়ে থাকি! সাতদিনের মাথায় হাজির দিয়ে গোময় পরিসংখ্যান পেশ করব।

সন্ধে থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। টিপটিপ বৃষ্টি। তুমুল ঝড় জল আসছে। বাড়ির সামনে একটা জিপ এসে দাঁড়াল। তিন হাজার এখনও হয়নি, হবে শুনেই ভি আই পি'রা আসতে শুরু করেছেন। তাও কেমন দিনে, ঝড়ের রাতে। কার এই অভিসার!

আমাদের অফিসের ড্রাইভার ইসমাইল জিপ থেকে নেমে এল। বগলে একটা ফাইল।

কে পাঠালেন?

বড় সায়েব।

ইসমাইল, আমি তো ভাই এখন কিছু লিখতে পারব না। আমার হাতের অবস্থা দেখো। তিন মাসের আগে এ হাতে কলম ধরা যাবে কিনা সন্দেহ।

সে আর আমাকে বলে কী হবে স্যার! আপনি বড় সায়েবকে বলুন।

তড়াক করে লাফিয়ে জিপে উঠে, ইসমাইল কালবিলম্ব না করে চলে গেল। থাকলেই আমার কাঁদুনি শুনতে হবে। কুকুরে কামড়াবার পর থেকেই আমার আচার আচরণ কিঞ্চিৎ কুকুর কুকুর হয়ে গেছে। করুণ সুরে কথা বলতে গেলে এক ধরনের কুঁই কুঁই শব্দ হচ্ছে। রেগে গেলে গর্‌র্ গর্‌র্। আমার মনে হয় তার আগে থেকেই হয়েছে। যবে থেকে মন্ত্রী মহোদয়ের সান্নিধ্যে এসেছি।

ফাইলটা খুলতেই একটা নোট বেরিয়ে এল। বড় কর্তার হুমকি:

আগামীকাল সকাল সাতটার মধ্যে খাজারামকে চুটিয়ে গালাগাল দিয়ে একটা বক্তৃতা লিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করবেন হাসপাতালের লেম্যানস ওয়ার্ডে। জিপ দুর্ঘটনায় আজ সকালে তিনি আহত হয়েছেন। ঠ্যাং ভেঙে গেছে! জরুরী, জরুরী, জরুরী।

খাজারাম সম্প্রতি দল ভেঙে বেরিয়ে গেছেন। তিনি আর একটি

দল করেছেন। আলাদা সিম্বল, আলাদা ম্যানিফেস্টো। নির্বাচনে নামছেন। খুব হম্বিতম্বি করছেন। বড় বড় বোলচাল মারছেন। মন্ত্রীর মত আমারও খুব রাগ। পার্টি কমজোর হয়ে যাচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বে। ধুনোর আঠা দিয়ে সাঁটা মেয়েদের সেলাইয়ের বাকসের মত সব খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।

গালাগালের তুবড়ি ছোটাতে পারি। বাদ সেধেছে হাত। ফুলে ফেঁপে ঢোল। তিন হাজারের খেলা। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়, আমার হাত ফুলে মনুমেন্ট। বড় অসহায় অবস্থা। ওদিকে মন্ত্রী পড়লেন ঠ্যাং ভেঙে, এদিকে তাঁর কলমচির হাত খাবলাচ্ছে নেকড়ে বাঘে। খাজারাম গলাবাজি করছে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে ফেরাতেই হবে। নইলে আমাদের আখেরে কাঁচকলা।

মাঝরাতে বৃষ্টি নামল তেড়ে। ঘণ্টা চারেকেই কলকাতা কাত। একেবারে কল্লোলিনী কেলেঙ্কারি। সব হাবুডুবু। বক্তৃতা লেখা হয়নি, তার একটা জেনুইন কারণ আছে। না হাজিরা দিলে চাকরি চলে যাবে।

বাসও চলবে না, ট্রাম তো সামান্য বৃষ্টিতেই ঠ্যাং তুলে বসে থাকবে। হাফপ্যান্ট পরে জলে নেমে পড়াই চাকরি বাঁচাবার একমাত্র রাস্তা। জল ভেঙে, রিকশা ঠেকিয়ে যখন হাসপাতালে পেঁছিলুম তখন সর্বাঙ্গে ঝাঁঝি আর কচুরিপানার কুচি লেগে আছে। বেশ রোহিত মৎস্যের মত খেলে খেলে এসেছি। ওয়ার্ডের বাইরে একটা বেঞ্চিতে মুখার্জি সায়েব বসে আছেন বিরস বদনে। মালকোঁচা মারা ধুতি ভিজে সপসপে।

স্যার আপনি?

তুমি যদি ফেল কর, মন্ত্রীকে ঠেকাতে হবে তো। তোমার হাতে কী হল!

আজ্ঞে কুকুর কামড়েছে।

আঃ, তুমি আবার এই দুর্দিনে কুকুর নিয়ে ছেলেখেলা করতে গেলে। ইলেকসানের পর করলে হত না। যাক, লেখা হয়েছে?

আজ্ঞে, না!

সে কী! সারা রাত তাহলে কী করলে তুমি?

কী করে লিখব স্যার। হাতটা তো অকেজো হয়ে গেছে। ভিজে জামার পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন সাঁ করে। ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমি ফাঁসিতে চলেছি।

তোমার মন্ত্রী তুমি সামলাও, আমার কী ?

মন্ত্রী কি স্যার আমার একার ? তিনি সকলের, সারা দেশের।

ঠিক আছে ? ভেতরে যাও বুঝবে ঠ্যালা।

কেবিনের বাইরে পুলিশ পাহারা। কোথায় যাবেন ?

মন্ত্রী ডেকেছেন। আমার নাম বলুন।

ভেতরে মন্ত্রী মহোদয় চিল চিৎকার করছেন। সংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে। ভেতরে যাবার অনুমতি মিলল।

কী সুন্দর দৃশ্য—ট্রামের ট্রলির মত একটা ঠ্যাং ওপর দিকে তুলে মন্ত্রী আমার শয্যাশায়ী। মাথার দিকে গুরুগম্ভীর চেহারার দু'জন ডাক্তার, দু'জন নার্স। পাশের চেয়ারে আমার মুখ চেনা এক বড় কর্তা। যিনি আমাকে একবার বেলা দেড়টার সময় গরম রসগোল্লা খাবার বায়না ধরে দুপুর রোদে সারা ব্রাবোর্ন রোড চষিয়ে মেরেছিলেন। এক এক মাড়োয়ারী মিষ্টির দোকানে ঢুকি আর জিজ্ঞেস করি গরম রসগোল্লা হ্যায় ? তারা হাঁ করে মুখের দিকে তাকায় আর বলে, রসগোল্লা হ্যায়, লেকিন গরম কাঁহাসে মিলেগা। রাত বারো বাজে আইয়ে।

তিনি এখন খুব আমড়াগাছি করছেন, আপনি যদি বাঁদিকে একটা ডাইভ মারতেন স্যার ?

ইডিয়েট। তাহলে তো মরেই যেতুম। মরলে খুব সুবিধে হয়, তাই না ? জিপ তো বাঁ দিকে ওলটায়। তাহলে স্যার ডানদিকে মারলেন না কেন ?

তাই তো মেরেছিলুম। গিয়ারে পা আটকে লাট খেয়ে গেলুম।

অ্যাকসিডেন্টের আগে যদি নেমে পড়তেন।

মন্ত্রী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, এই, এটাকে বার করে দাও তো। ওই মুর্খটাকে।

পুলিশ ছুটে এল, আপনি স্যার বাইরে যান তো, উনি বিরক্ত হচ্ছেন।

গরম রসগোল্লা বেরিয়ে গেলেন।

মন্ত্রী মহোদয় আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। বেশ স্নেহ মাখানো গলায় বললেন, কী, লিখে এনেছ?

আজ্ঞে না স্যার।

হোয়াট? তুমি লেখনি?

আমার হাত গেছে স্যার। কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।

ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র। ও খাজারামের লোক। ওকে পরীক্ষা কর তো।

ডাক্তারবাবুরা বললেন, কোন্ দলের লোক, স্টেথিসকোপ কিংবা এক্সরেতে ধরা পড়বে না।

মূর্খ, ওর হাতটা পরীক্ষা কর। সত্যিই কুকুরে কামড়েছে কি না?

একজন নার্স এগিয়ে পড়পড় করে আমার ব্যান্ডেজ খুলে ফেললেন, স্যার সাংঘাতিক কামড়েছে। সেপটিক মত হয়ে গেছে।

বলো কী! কার কুকুর কামড়েছে তোমাকে?

একটু মিথ্যে বললুম, আজ্ঞে হুগলীতে যখন গোবর সারভে করছিলুম, সেই সময় এক গোয়ালের বাইরে একটা বাঘের মত কুকুর শুয়েছিল। আমি নশ্বর একটি গরুর পেটে হাত দিয়ে যেই বলেছি, মা ভাগবতী একটু কর তো, কুকুরটা অমনি লাফিয়ে এসে খ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।

ইনএফিসিয়েনসি অফ দি ডি-এম। গ্রস নেগলিজেনস অফ ডিউটিস। আমাকে দেখতে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বললেন, আহা, পা-টা অমন করে নাড়াবেন না স্যার। ওয়েট দেওয়া আছে। ট্র্যাকসান ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে। সেরে উঠে যা হয় করবেন।

তুমি ইনজেকসান নিয়েছ?

আজ্ঞে না স্যার। ডি-এম টোয়েন্টিফোর পরগনা বললেন, কুকুরটা যখন পাগল ছিল না তখন না নিলেও চলবে।

হি নোজ নাথিং। এই একে একটা ভ্যাকসিন ঠুকে দাও তো এখুনি।

পেছু হটে দরজার দিকে সরছি। একজন নার্স বললেন, পালাচ্ছে স্যার।

চেপে ধরো, চেপে ধরো।

নারী-বাহিনী চেপে ধরল।

মন্ত্রী বললেন, আমি মন্ত্রী বলছি, তোমাকে নিতে হবে।

তলপেটে প্যাঁক করে ছ সি সি সেরাম ফুঁড়ে দেওয়া হল। যেমন কর্ম তেমন ফল।

মন্ত্রী বললেন, এইবার কাজের কথা।

হ্যাঁ স্যার কাজের কথা।

লিখতে যখন পারনি, তখন বলতে তো পারবে?

কী স্যার?

ওই খাজারামকে নস্যাৎ করে দুচার কথা?

কোথায় স্যার?

তিনদিন পরে একটা আসনের জন্যে পার্লামেন্টারি বাই ইলেকসান। আমার ক্যান্ডিডেট হেরে যাক, ডু ইউ ওয়ান্ট দ্যাট?

নো স্যার!

তাহলে আজই আমরা যাব।

ডাক্তারবাবুরা বললেন, আমরা এই অবস্থায় আপনাকে যেতে দোব না।

তোমাদের বাপ দেবে।

আমি মিউ মিউ করে বললুম, এখন আর কুকুরের ঘেউ নয় বেড়ালের মিউ, ইলেকসান পড়েছে যে, পলিটিকসে জড়ালে আমার চাকরি চলে যাবে স্যার!

না জড়ালেও যাবে। আমি যাইয়ে দোব।

মরেছে, এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

ঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতাল থেকে অভিনব একটি শোভাযাত্রা বেরল। উদাস শহর কলকাতা সেভাবে তাকিয়ে দেখল না। দেখলে নজরে পড়ত, একটি সাদা অ্যামবাসাডার, পেছনে রাগী রাগী চেহারার এক মানুষ। ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান পা সামনের দিকে ট্রলির মত প্রসারিত প্রান্ত ভাগে একটি বাটখারা ঝুলছে। ট্রাক থেকে

বেরিয়ে থাকা লোহার 'বারে' যেমন হুঁসিয়ারি লাল চাকতি ঝোলে। চারপাশে বালিশ। তিনি সেট হয়ে বসে আছেন। পাশেই বিমর্ষ চেহারার একটি ছেলে। বুকের কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত স্লিংয়ে ঝুলছে। মুখটা মাঝে মাঝে বিকৃত হচ্ছে। তলপেটে সিঙি মাছ কাঁটা মারছে।

পেছনে আর একটি গাড়িতে দু'জন হাড়বিশেষজ্ঞ, একজন সেবিকা, ওষুধপত্র।

মিছিল ক্রমশ রাজনীতির অন্ধকারে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেল। আর ফিরে এল না, পতাকা উড়িয়ে স্লোগান দিতে দিতে। এখন কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও এক বাজারে মধ্যবয়সী একটি ছোকরা গামছা বিক্রি করে। কেউ জানে না, তার দাম তিন হাজার টাকা। এখন সে দিন আনে আর দিন খায়, কিন্তু সুখে আছে। কোনও বৃশ্চিক দংশন নেই। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছে।
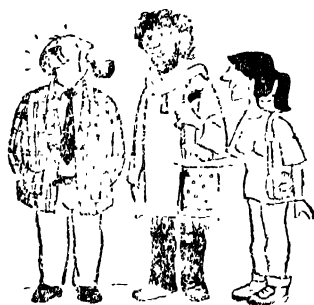
ভূমিকা

আমরা ক্রমশই খুব সভ্য হয়ে উঠছি। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, চেতনার উন্নতি হয়েছে। সংকীর্ণতা কমে এসেছে। সমাজ-সচেতনতা বেড়েছে। বিজ্ঞান বিস্ময়করভাবে প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করেছে। আমরা আর আগের মত নেই। দেবতার কাছা-কাছি চলে এসেছি। সত্যই আমরা অমৃতের সন্তান। ভাল করে তাকালে আমাদের মাথার পেছনের দেয়ালে আলোর গোলাকার ছটা দেখা যাবে।

সংকীর্ণতা, স্বার্থান্বেষ, লোভ যেটুকু চোখে পড়ছে, তা আমাদের পরিশীলিত আচার-আচরণের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যদি আগের চেয়ে উদার না হয়ে থাকি, তাহলে এত মানুষ এক জায়গায় শান্তিতে বাস করছি কি করে! ষাঁড়ের দৃষ্টান্তই তুলে ধরা যাক। দুটো মাত্র ষাঁড় এক জায়গায় হলেই শিঙে শিঙে লাগিয়ে, ঠেলাঠেলি করে কিছুক্ষণের জন্যে যানবাহন বন্ধ করে দেয়। আমরা নিশ্চয়ই ষাঁড়ের চেয়ে উন্নত। হ্যারিসন রোডের কাছে কখনও কি দেখা গেছে দুটো বিশাল মানুষ মাথায় মাথা লাগিয়ে পরস্পরকে ঠেলছে! ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ! না, এ দৃশ্য দেখা যাবে না। অথচ সেই পরশ্রীকাতর ষাঁড় মহেশ্বরের বাহন! আর মানুষ হল শয়তানের আপেল-খেকো ইডেনভ্রষ্ট জীব।

বেদান্তে ঈশ্বরের কাছে পেঁছিবার একটা সহজ রাস্তা আছে। সেই রাস্তাটি হল নেতি, নেতি। এটা নয়, ওটা নয়, সেটা নয় করতে করতে আসল সত্যটিকে ল্যাম্পপোস্টের মত জাপটে ধরে চিৎকার করে ওটা : সোহং। সেই নীতিই প্রয়োগ করে নিজেকে এইভাবে চেনা যেতে পারে, যেমন আমি ষাঁড় নই, কারণ আমার শিং নেই, আমি গুঁতোই না। মাঝে-মধ্যে হাঁটুর গুঁতো মারি, কনুই চালাই, অবশ্যই বিপাকে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'সরি' বলি। এক সময়-কার দেবভাষা। ষাঁড় কি শিং দিয়ে গুঁতো মেরে 'সরি' বলে! বলে না। আমার গুঁতো অত্যন্ত উঁচুমানের গুঁতো। তার প্রয়োগ যানবাহনে আরোহণ, অবরোহণের সময়। ঈশ্বরলাভের জন্যে বহু-প্রকারের যোগ, মুদ্রা ও প্রাণায়াম বিধির প্রচলন আছে। সবই সিদ্ধসাধক নির্দিষ্ট পথ। এই জনভারাক্রান্ত দেবভূমিতে অফিস-যাত্রী দেবতাদের জন্যে রথের সংখ্যা বড়ই কম। ওদিকে দপ্তরে দপ্তরে অপ্সরা-পরিবৃত ইন্দ্রের দেবসভায় ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে না পারলে খোদেশ্বর ক্ষিপ্ত হবেন। রথলাভকে ঈশ্বর লাভের তুল্য জ্ঞান করলে গুঁতো এবং কনুইয়ের সুপ্রয়োগ এক ধরনের হটযোগ কিংবা মুষ্টিযোগের পর্যায়েই পড়বে। সেই যোগে কোনও দেবতা যদি ভূতলে পতিত হন অথবা রথচক্রে নিষ্পেষিত হন, তাহলে দেবভাষায় আমরা দেবোক্তিই করতে পারি : নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

আমার আমিটাই যখন সব, তখন অন্যের আমি নিয়ে মাথা ঘামাবার কি বা প্রয়োজন! অন্যের আমি অন্যে সামলাক, আমার আমিকে আমি সামলাই। জীবনের পথ তো বড় সোজা নয়, দেবতার পথ আরও দুর্গম : ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া। সুতরাং একটু নড়েচড়ে, গ্যাঁট হয়ে খেলিয়ে বসি! শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থঃ'। আমি ক্লিব নই। আমি ব্রহ্ম। আমার হাঁটুর ওপর ব্রিফকেস ফেলে, দুপাশে ডেঙ্গো-ডাঁটার মত ঠ্যাং ছড়িয়ে, সন্ধের পর সামান্য সোমরস পান করে, তাম্বুল চিবোতে চিবোতে, লর্ডের মত বসে থাকব মিনি রথের জোড়া আসনে। অন্যের অসুবিধে। হচ্ছে হোক। তা বলে আমি

অসভ্য নই। ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণে বিশ্বাসী! আমি যে অসভ্য প্রমাণ কর। উদাহরণ দিয়ে সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত কর। অসভ্যেরা উলঙ্গ হয়। আমি উলঙ্গ নই। ভারতের শ্রেষ্ঠ মিলের তৈরি জামা-কাপড় আমার পরিধানে! অসভ্যেরা সাবান, পাউডার ইত্যাদি প্রসাধন ব্যবহার করে না। আমি করি। তারা কাঁচা মাংস খায়। আমি চিকেন তন্দুরি খাই। কোনও অসভ্যের বাবাও অমন সুস্বাদু রান্না করতে পারবে না। অসভ্যেরা নখ কাটে না, দাড়ি কামায় না। আমি সপ্তাহে একবার নখ কাটি, রোজই বিলিতি ব্লেডে দাড়ি কামাই। অসভ্যরা জঙ্গলে বাস করে, আমি কলকাতা নামক শহরের সুরম্য ফ্ল্যাটে বসবাস করি। রেডিও শুনি, টিভি দেখি, রেকর্ড প্লেয়ার চালাই। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল বের করে খাই। হাজারটা উদাহরণ উদ্ধৃত করে আমি যে অসভ্য নই, তা প্রমাণ করে দোব। ন্যায়শাস্ত্রে একে বলে খণ্ডন। আমি এখন চলন্ত গাড়ি থেকে থুঃ করে থুতু ফেলব। একবারও পথচারীদের কথা ভাবব না। এই জন্যে ভাবব না, আমি তো পথচারী নই এখন। শুধু তাই নয়, গতি আমাকে নিমেষে নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাবে। আমি এখন দাঁতখোঁচা দিয়ে দাঁত খুঁটে প্রাপ্ত খাদ্যাংশ সামনে কুত করে ছুঁড়ব! কারুর গায়ে পড়বে। পড়ুক। এক আমি ভেঙে ভেঙে বহু আমি হয়েছে। যার গায়ে পড়ল সেও তো আমি। দৃষ্টিভঙ্গি পালটে ফেললে মানুষের দেবত্বের প্রমাণ দিকে দিকে!

আমি হৃদয়হীন নই। আবার সেই প্রমাণ। যারা খুন করে, তারাই হৃদয়হীন, আমি কাউকে খুন করিনি। খুন করলে জেলে যেতুম। যেহেতু জেলে যাইনি, সেইহেতু 'ল অফ দি ল্যাণ্ড' অনুসারে আমি সাধু। সাধুরা হৃদয়হীন হতে পারে না। যাঁরা বলেন কর্মস্থলে আমি চক্রান্ত করে উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি না ঘটিয়ে তৈল প্রদানকারীরই স্বার্থ দেখি, তাঁরা ভুল ব্যাখ্যা করেন। তেল দিতে না চাওয়াটা এক ধরনের অহঙ্কাব। আমি কাউকে তেল দিই না। আমি কারুর পায়ে ধরে বড় হতে চাই না। সাধনমার্গে অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা অহমিকা। অহঙ্কারী মানুষ উচ্চমার্গে

ওঠার অধিকারী নয়। আমি নিজে অহম্ বিসর্জন দিয়ে, নানাভাবে সন্তুষ্ট করে ইন্দ্রের কাছাকাছি একটি আসন লাভ করেছি সাধনার জোরে! আমি জানি রামকৃষ্ণ কত বড় সত্য কথা বলেছিলেন, অহঙ্কারের ফেঁসো উঠে থাকলে সুতো ছুঁচের গর্তে কিছুতেই ঢুকবে না।

মানুষকে দু শ্রেণীতে ভাগ করে নিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়: কর্মী আর কর্মহীন। কর্মহীনদের জাগতিক আচরণ থেকে সহজেই বাদ দেওয়া চলে। তারা হল ভাগিদার। কিছুই না করে জায়গা দখল করে বসে আছে। পরান্ন ধ্বংস করে চলেছে। কোনও এক দেশে অত্যাচারী, ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ও জীবজন্তু মেরে ফেলার প্রকল্প চালু আছে, যেমন চড়াই পাখি, কাক, পঙ্গপাল ইত্যাদি। সেই প্রকল্প এদেশে চালু করার অনেক বাধা। কারণ যারা কিছু করে না তারা ভোট দেয়। এরা অবশ্য দিনে দিনে ক্ষয় পাবে। প্রথমত রাজনৈতিক কামানের মানব-গোলা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পেটের দায়ে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি করতে গিয়ে মার খেয়ে মরবে। নেশা-ভাঙ করতে করতে টেঁসে যাবে। ব্যাপারটা খুব ধীরে ধীরে হবে। তা হোক। তবু রাস্তা খোলা রইল। আর যারা যাবেই, তাদের অহমিকারও মূল্য নেই, বাতুলতাও কর্ণপাতের অপেক্ষা রাখে না। ওরা হল ক্ল্যামারিং মাস। একটা একটা করে না দেখে তাল হিসেবেই দেখা উচিত, দেখা হয়ও। সেই ভাবেই বস্তিতে, ঝুপড়িতে থাকে। এদের অপরাধপ্রবণতা, এদের যৌনতা এদের পুষ্টিহীন বেঁচে থাকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট করা যায়। মাঝে-মধ্যে সোয়াবিন, চাপ ছোলার ডাল, গমো আটা আর ভেলি গুড় মিশিয়ে পাউরুটি তৈরি করে নিউট্রি-শানাল ব্রেড নাম দিয়ে এদের মধ্যে বিতরণ করে সমাজসেবীর সম্মান পাওয়া যায়, খেতাব পাওয়া যায়। সমাজসেবী সংস্থা এদের দৌলতেই দেশী বিদেশী অর্থ সাহায্য পেতে পারে। বিদেশী সাহায্যের গুঁড়ো দুধ, বাটার অয়েল ব্ল্যাকে ঝেড়ে দিয়ে নিজেদের বিলাতির খরচ তুলে নিতে পারে। সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা বিদেশে সেমিনার করতে যেতে পারে। সুতরাং এরা একেবারে মরে হেজে গেলে বড়ো অসুবিধে

হবে। এদের মেয়েদের শ্লীলতাহানি করা যায় বলে হোমস বেঁচে আছে। হোমস-এ নানারকম হাতের কাজ হয়। সেই সব কাজ দিয়ে অনেকে অল্প খরচে ঘর সাজাতে পারেন। এদের পাপে ওপর-তলার অনেকে পাপের সুযোগ পান। সেই সব হোয়াইট কালার ক্রাইম মাঝে-মধ্যে কাগজে হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেলে চায়ের দোকান সরগরম হয়। মধ্যবিত্তরা বেশ আনন্দ পান। সাহস আর সুযোগের অভাবে নিজে যে পাপ করতে পারিনি, সেই পাপ অন্যে করেছে দেখলে নিজের খাই খাই আত্মার আংশিক আহার হয়। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মত। আমরা যারা কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কিছু করি আর না করি মাসের শেষে মাইনে পাই, তারা তো আর তেমন গায়ে-গতরে হতে পারে না! তাদের মস্তিষ্কটাই বড় হয়। তারা বুদ্ধিজীবী। শ্রমজীবী নয়। তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্যে এমনকি মুখের সামনে এক গেলাস জল এগিয়ে দেবার জন্যেও একজন লোক চাই। সে আবার কেমন হবে? বামুনের গরুর মত। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। এমন মানুষ কারা সাপ্লাই দেবে? কেন এই হ্যাভ নটসরা। দেশটা আমেরিকার মত উন্নত হয়ে গেলে মহাবিপদ হবে। ফোর্ড গাড়ি চেপে যদি রাঁধুনি আসে, কি সুইপার, কি ডিশ ওয়াশার আসে আর রোজ দশ ডলার পারিশ্রমিক চায়, তাহলে হোয়াইট কালারদের মুখ যে হোয়া-ইট হয়ে যাবে। তাই ওরা থাক। তেল দিক আর না দিক ফুটপাথে ঝুপড়িতে ওদের বংশবৃদ্ধি হোক। আমাদের রোদে বড়ো কষ্ট হয়, জলে ভিজলে কপালে শ্লেষ্মা জমে, ভারী কিছু তুলতে গেলে ফিক ব্যথা লাগে, নিচু হতে গেলে কোমরে স্লিপ ডিস্ক। আমাদের মহিলাদের রান্নাবান্না একঘেঁয়ে লাগে। তারা উওম্যানস লিব্ বলে চেল্লাচিল্লি করছে। দাস-দাসী নিয়ে গায়ে ফুঁ লাগিয়ে মুখে মেক-আপ করে সংসার করতে গেলে আমাদের বড়ো দাস হতে হবে। তেল মেরে ঠাট রাখতে হবে। অহং নিয়ে লম্পঝম্প করতে গেলে হাতে হ্যারিকেন হবে। আমাদের তাই গৃহে কালোয়াতি, কর্মস্থলে দাসত্ব। পাড়ার প্রিন্স সেরেস্তার কৃতদাস। এতে অগৌরবের তো কিছু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নিজেকে সমর্পণ কর।'

শ্রীকৃষ্ণ কে ? জীবনরথের সারথি তিনি। তার মানে জীবিকা।

বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। কিভাবে বেঁচে থাকব, সেটা বড় নয়। সভ্যজগতে অনেক সভ্য জীবিকা আছে। সভ্য নামে সহনীয়। যেমন দালাল বললে রেগে যাব। মিডলম্যান বললে তেমন খারাপ শোনাবে না। চামচা বললে মুখ ভার হবে, ফলোয়ারস বা অ্যাসোসিয়েটস বললে বিগলিত হবে। ষড়যন্ত্রকারী বললে প্রহার দিতে পারি। ম্যানিপুলেটারস বললে ক্ষমা করে দোব।

The life is more than the meat.

বসুধৈব কুটুম্বকম এ যুগের বিধান নয়।

যে মানুষ চাকরি করে, যে মানুষ বহুতল বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে জীবন কাটায়, সুখী পরিবারের আধুনিক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে তারা পাশের খুপরির মানুষের সঙ্গেই কুটুম্বিতা করতে পারে না তো বসুধা। জীবনের ওপর জীবিকার বেশ বড় রকমের একটা প্রভাব আছে। দাস আমি, সে যত বড় দাসই হোক না কেন, সংকীর্ণ আমি! প্রচুর মাইনে, অনেক সুযোগ-সুবিধে। সাজানো ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন, ফ্রীজ, এয়ার কুলার, ট্রাভেল, পার্টি, সুন্দরী স্ত্রী, হাই কানেকশান। জীবন একেবারে বজবজে। হলে কি হবে? সেই ছেলেবেলার যাত্রার আসর? সামনে অসংখ্য মাথা। দর্শক উচ্চতায় খাটো। একটি মাত্র বেঞ্চি। উঠে দাঁড়ালে ভাল দেখা যায়। সবাই উঠতে চায়। এ ওঠে তো ও পড়ে, ও ওঠে তো এ পড়ে। জীবিকার উঁচু মাচান থেকে প্রতিযোগীর ধাক্কায় পড়ে যাবার আতঙ্কে কেরিয়ার শিকারী রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে। চেষ্টা করেছ কি মরেছ।

একটা জায়গায় মানুষ 'প্রটেকটিভ' হলে সাইকোলজিস্টদের ধারণা সে মানুষের পারসোনালিটি হবে 'ক্লোজড'। ক্রমশই উদারতার মৃত্যু হচ্ছে। ইংরেজের কায়দায় আমরা এখন পরস্পরের সঙ্গে 'নডিং টার্মসে' নেমে এসেছি। সম্পর্ক, কেমন আছেন, ভাল আছি। চালাক বলবেন, বেশি 'হবনবিং' ভালো না। প্রথমত মানুষের আর সে অফুরন্ত সময় নেই। আমার কাজ আছে। মুখে নির্লজ্জের মত বলতে না পারলেও, মনে অস্বস্তি। অ্যা, ঠিক

কাজের সময় জ্বালাতে এল। কাজটা কি? কৌরিয়ার পালিশ। চকচকে, আরও চকচকে। আরও ক্ষমতা, কোথায় ক্ষমতা। সেরেস্তায়। পৃথিবী বিশাল। বিশালে স্থান পাওয়া কঠিন। সেখানে কে তুমি হরিদাস পাল। যাদের ওপর ডা'ডা ঘোরানো যায় তারা হল দাসের দাস। জীবিকা আমাদের 'স্যাডিস্ট' করে তুলেছে। এই 'স্যাডিজম' ওপর থেকে নিচের তলা পর্যন্ত চলে গেছে! রসায়নের ভাষায় যাকে বলা চলে 'পারকোলেশান'। চাকুরিজীবী মানুষ তুমি, 'মিলার অফ দি ডি'র মত, রাতে নিশ্চিন্ত আরামে নিশ্ছিদ্র ঘুমে তলিয়ে যাবে তা তো হয় না। প্রতিদিন আউনস মেপে তোমার অপমানের ঝুলি ভরা হবে। তোমার 'আমি'কে প্রতিদিন চট্‌কে বিকলাঙ্গ করে তোলা হবে। এই সভ্যতাতেই সেই ঘটনা ঘটে। ডিকেনসের 'অলিভার টুইস্টে'র কাল থেকে সমাজ এক চুলও কি এগিয়েছে? চাইল্‌ড লিফটিং বেড়েছে বৈ কমেনি। শিশুকে হাঁড়ি কিংবা কলসির মধ্যে পুরে রেখে বিকৃত করে পথের পাশে বসিয়ে রাখা হয়। যে মানুষ এমন কাজ সহজে পারে, সেই মানুষই আবার পকেটে হাত ঢোকায় ভিক্ষে দেবার জন্যে। অনুকম্পায় হায় হায় করে ওঠে। এখানেই স্বর্গ, এখানেই নরক। দেবতা আর শয়তান একই আকাশের তলায় গুলতানি করছে। সিনডিকেট তৈরি করে বিকলাঙ্গ বানাবার ঘটনা অপরাধ জগতের ব্যাপার। আর যাঁরা প্রতিদিন সুস্থ মানুষের আমি চট্‌কে ব্যক্তিত্বের নির্যাস বের করে ক্রীতদাস তৈরির চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিচার করার কেউ নেই। আর একবার 'আংকল টমাস কেবিন' লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গণতন্ত্র মার্চ করছে। সমাজতন্ত্র মানুষকে মানুষ করে দিয়েছে। আমরা সবাই রাজা, এই রাজার রাজত্বে। স্বর্গের জানালা খুলে অজস্র তারার চোখে ঈশ্বর তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে। মানুষের মাথা আকাশের চাঁদোয়ায় গিয়ে ঠেকেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সেই বিশ্বস্রষ্টার কানের কাছে বিপ্‌ বিপ্‌ করে চলেছে অষ্টপ্রহর।

তবু কেন ঘুম আসে না। ঘরের দেয়ালে 'সাটিন সিল্ক'। হাল্‌কা রঙের খোশ মেজাজে দামী আলোর শেড বেয়ে নেমে আসা

বিদ্যুতের আলোয় অবগাহন করছে। ক্যালেন্ডারের নীল জলে রাজহাঁসের মত পাল তুলেছে ইয়ট। চির, চেনার মাথা তুলেছে, পেছনে পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। পা ডোবানো কার্পেটে ইরানী লতাপাতা। অকালেই সেই বৃদ্ধ শিল্পীর কথা মনে পড়ে। এক মাথা পাকা চুল। নাকের ওপর ঝুলছে দড়ি জড়ানো নিকেলের গোল চশমা। হাতে ছুঁচ আর পশম। সারাজীবন যে শুধু কার্পেটে নক্সা তুলে গেল। যার দুটো পা পাথরের মেঝের শীতল স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই পেল না। যার স্যাঁতসেঁতে ঘরের বাগিচায় বুলবুলি ডেকে যায়। বৃদ্ধ শুনতে পায় না। অপুষ্টিতে কান গেছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জে আঙুর ঝোলে লাল হয়ে। আপেল গাছে ফুল আসে। এত বড় পৃথিবীতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের আয়োজন বড়ো সঙ্কীর্ণ। কম জোর ফুসফুস, ক্ষীণ দৃষ্টি, কয়েকটা বাজরার রুটি, ছেঁড়া তালিমারা পশমের জামা, গোটা কতক মোটা কম্বল আর অপরিসীম শিল্পচেতনা, এই পথে তো জীবনের বৈভব। ভাগ্য পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই তো বাঁচতে শিখিয়েছে। পাহাড়ের মাথা থেকে বরফ চুঁইয়ে শীত নেমে আসে। বৃদ্ধ তবু শান্তিতে ঘুমোয়। ঘুমোতে পারে না সে, সেই নরোত্তম যার অভ্রোত্তম দেয়াল থেকে দেয়ালে মেঝে ঠাসা গালচের ওপর লোমশ কুকুর হামা দিয়ে বসে থাকে। চকচকে ফ্রিজের কফিনে নরম আলোয় ওৎ পেতে থাকে বরফ শীতল দ্রাক্ষারস। কৃত্রিম চামড়া বাঁধানো সার সার সোফাসেট দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মাফিয়া নেতাদের মত সারা রাত ঐশ্বর্যের ষড়যন্ত্র করে। ডিজিট্যাল ঘড়ি আলোর অক্ষরে জানাতে থাকে, আমি তোমার সময়, অনবরতই চলেছি, চলেছি। কালের দিকে চলেছি। Which is today tomorrw will be yesterday। চাঁদের আলোয় নিচের লনে সাদা মটোরের বনেটে শিশির জমছে মাঝ রাতে। বড়ো একা, বড়ো একা। প্রেম করো। তোমার এত আয়োজন। সুকোমল শয্যা, বড়ো উদ্বেল করা সুগন্ধ। ভারী ভারী পর্দা। খাবার টেবিলে মুর্গমসল্লম। একটু হাসো। দিলখোলা হাসি। হাসি আসছে না। অন্তরে গুমরে ফিরছে কান্না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক বড়ো ঠুনকো। সব জোড়

খুলে যাচ্ছে। শিল্পের জগতে অনেক শক্তিশালী 'অ্যাডহেসিভ' বেরিয়েছে। কি না জোড়া যায় তাতে! সম্পর্ক কিন্তু জোড়ে না। মনের ফাটল বেড়েই চলেছে। স্ত্রী অসংলগ্ন। পুত্র কন্যারা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দূর থেকে দূরে চলেছে। আয়োজন সাজানো শ্মশান। শয্যাসঙ্গী ঘিনঘিনে দুশ্চিন্তা। জীবন শেক্সপীয়রের সেই কৃষক, Who hanged himself in expectation of plenty। ট্যানটেলেসের সেই কাপ। ঠোঁটের এক ইঞ্চি দূরে ঝুলে থাকে। চুমুক দেওয়া যায় না। এ যেন সেই ক্যাবারে নর্তকী। খুব সেজে পাদ-প্রদীপের সামনে এসেছে। ঘুরে ঘুরে নাচছে। মনে মনে প্রস্তুত। রোমশ হাত এগিয়ে আসবে। শুরু হবে বস্ত্র-হরণের পালা। শেষ দৃশ্যে সম্পূর্ণ উদম। এ নিয়তি কেউ ফেরাতে পারবে না। এ খেলা চলে আসছে সেই মহাভারতের কাল থেকে। কৃষ্ণ কোথায়?

অনিশ্চয়তার রাজারা বসে আছেন সর্বত্র। ফৌজ তৈরি। অসংখ্য পেরেক, ক্রুশ আর কাঁটার মুকুটের আয়োজন। হাজার যীশু প্রস্তুত হচ্ছেন, হাজার সিজার অশ্রুত কোরাসে বলছেন, এত তু ব্রুটাস। সিজারে আর ব্রুটাসে খেলা চলেছে। খেলাটা হল, খেয়ে পরে বেঁচে থাক, তবে মানুষের মন নিয়ে নয়, পশুর মন নিয়ে। বাবুর বাড়ির কুকুর খুব সুখে থাকে। সকালে বিস্কুট, দুপুরে মাংসভাত, রাতে দুধ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, নিয়মমত চান, লোমে বুরুশ; কিন্তু ভীষণ বাধ্য হতে হবে। প্রভুকে দেখে ন্যাজ নাড়তে হবে। সামনের দুটো পা দিয়ে বুকে উঠে দাঁড়িয়ে চুকচুক করে মুখটা একটু চেটে দিতে হবে। ন্যাজ নেড়ে, মাথা নেড়ে, পাগলামি করে বোঝাতে হবে, বড়ো আনন্দ। প্রভু বললেন, হ্যাঁ এই তো আমার কুকুর, ওয়েল ব্রেড ওয়েল ট্রেনড। পেডিগ্রিড কুকুর কি ট্রেনিং নেয় মশাই। একেবারে মানুষের মত। শুধু ভাষাটাই যা আলাদা। এ ডগ হ্যাজ এভরিথিং একসেপ্ট স্পিচ। ওর পেছনে, মাসে আমার কত খরচ জানেন? ডেলি মাংস, দুধ, ওষুধ। তবে হ্যাঁ, খরচে সুখ। বেইমানী করে না।

মাসে মাইনে চার কি পাঁচ হাজার টাকা। সাজানো ফ্ল্যাট।

গাড়ি। আশপাশ খরচের জন্যে অ্যালাউনস। পেডিগ্রি বাজিয়ে চেয়ারে বসানো হয়েছে। সব ঠাটই বজায় থাকবে, তবে ম্যানেজমেণ্টের কথা শুনে চলতে হবে। যাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করতে হবে তাদেরই ঘেউ ঘেউ করবে, যাদের দেখে ন্যাজ নাড়তে হবে, তাদের দেখে যেন ঘেউ ঘেউ করে ফেলে না। বুল-ডগ আর নেড়ি-ডগের ক্লেভার কম্বিনেশনই হল ঠাটবাট বজায় রাখার, ওপরে ওঠার চাবিকাঠি। চাপে থাক, চাপে রাখ। অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না। বিপ্লব-টিপ্লবের কথা বলতে পার, তবে বিশ্বাস করো না। রুশো, ভলটেয়ার, লেনিন, গুয়েভার, ক্যাস্ট্রো, ও সব হল সাইক্লোনের মত। নিম্নচাপ, ঊর্ধ্বচাপের খেলা। প্রভাব বেশি দিন থাকে না। ন্যাজ আবার বেঁকে যাবেই। ন্যাজের স্বভাব যাবে কোথায়? সিনেমার পোস্টার দেখনি? ভাই হোতো অ্যায়সা। সেই রকম ন্যাজ হোতো অ্যায়সা। কথাটা হল 'কনট্রোল'। নিয়ন্ত্রণ। সামলে রাখ, কান ধরে টান মার, বেশ করে মোচোড় মার। রাসকিনের কথায় মহাত্মাজীর মত চোগা-চাপকান ছেড়ে নাটালে চলে যেও না যেন। সব মহাত্মারই শেষ পাওনা একটি বুলেট। প্রমাণিত সত্য, কলমের চেয়ে টেলিস্কোপিক রাইফেল অনেক শক্তিশালী। গান্ধী রাজঘাটে, কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং আমেরিকায়। পড়তে পার, তবে বিশ্বাস করো না।

The life is more than the meat

The rich not only refused food to the poor, they refuse wisdom, they refuse virtue, they refuse salvation. Ye sheep without shepherd, it is not pasture that has been shut from you but the presence. Meat! perhaps your right to that may be pleadable; but other rights have to be pleaded first. Claim your crumbs from the table, if you will; but claim them as children, not as dogs; claim your right to be bed, but claim more loudly your right to be holy, perfect and pure;

তমসো মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সদ্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং

গময়। ঘুম আসে না, চারিদিকে বলাৎকারের চিৎকার। চলবে না, চলবে না। চলছে তো? এই ভাবেই চলছে, চলবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। মডার্ন মেডিসিন চেতনায় প্রলেপ লাগাবার স্মিত বটিকা বের করেছে। ব্যক্তিত্বকে চুরমার করে দেবার দাওয়াইও বিজ্ঞানের হাতে।

Where, where in Heaven am I ?

But don't tell me !

প্রেমে আর রণে যে কোনও কৌশল অবলম্বন করা চলে। শাস্ত্রের সমর্থন আছে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও অশ্বত্থামা হত জোরে বলে, ফিসফিস করে যোগ করেছিলেন ইতি গজ। রাজনীতিতে চাণক্য আছে। নীতি একটাই, কূটনীতি। মানুষের পৃথিবী মানুষের নিয়মেই চলবে। আদর্শ এক জিনিস, আচরণ আর এক জিনিস। একটা থিয়োরী, আর একটা প্র্যাকটিস।

মর্ত্যে স্বর্গ কোথায়! কল্পনায়! মর্ত্যে হল বিকিকিনির হাটে। এখানে যৌবন বিকোয়, অভিজ্ঞতা নিলামে চড়ে। শিক্ষা সোনার চাবিকাঠি দিয়ে সাফল্যের দরজা খোলে। অতীতে কিছু কল্পনা-প্রবণ মানুষ, ধর্ম নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, জীবন নিয়ে, পাতার পর পাতা বড় বড় কথা লিখে গেছেন! তখন কলকারখানা ছিল না, কোর্ট কাছারি ছিল না, নির্বাচন ছিল না, ইউনিয়ন ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ছিল না। পৃথিবীতে পোকার মত মানুষ গিজগিজ করত না। যে মানুষের মগজ থেকে বৈদিক সূক্ত বেরিয়েছিল, যে মগজে জন্মেছিল উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, সেই মানুষেরই মগজ সৃষ্টি করেছে পর্নোগ্রাফি, সেকস্ শপ, টর্চার মেশিন। যে মাটিতে যীশু, সেই মাটিতেই মোবুতু। মন্দিরের দশ হাত দূরেই বেশ্যালয়। একদল যখন মা মা করছেন আর একদল তখন মাগ মাগ। যে নারীতে মা, সেই নারীতেই মায়া। একজনের পায়ের ধুলো নিয়ে আর একজনের ঘাড়ে লম্ফ মারি। মূর্তি তৈরি করে সোনার সিংহাসনে বসাই, আবার সোনালি ব্রা পরিয়ে উলঙ্গ করে ক্যাবারে নাচাই। যে নারীতে আমার জন্ম, সেই নারীতেই আমার জারজ সন্তান। যে মাটিতে রাজা, সেই মাটিতেই

চেনে বাঁধা কৃতদাস। মানুষ কারুর প্রভু, কারুর দাস।

জীবনের বিচিত্র ভূমিকা।

বিভাসবাবু বড় চাকরি করেন। চাকরি যে করে তাকেই তো চাকর বলে। বিভাসবাবুকে চাকর বললে অনেকেরই চাকরি যাবে। তিনিও যে চাকর এই বোধ তাঁর সাবকনসাসে ছড়িয়ে আছে। চাকর বললেই তিনি রেগে যান। বলতে হবে অফিসার। ফার্স্টক্লাস, গেজেটেড অফিসার। বলতে হবে বড় সাহেব। আগে পরে স্যার জুড়তে হবে। ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হবে, মে আই কাম ইন স্যার। অধস্তনের দিকে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলবেন, ইয়েস। সামনে সারি সারি চেয়ার; কিন্তু বসা চলবে না। বসলেই একটা কর্কশ দৃষ্টি লেহন করবে সর্বাঙ্গ। অপরাধ বুঝে ওঠার আগেই সেই বড় সাহেবের অন্তরীক্ষে সর্বনাশের পরোয়ানা প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি তো তোমায় বসতে বলিনি হে কৃতদাস। যে জানে, সে কখনও বিনা অনুমতিতে বসার দুঃসাহস দেখায় না। বড় সাহেবের কামরায় হাত কচলানোই বিধেয়। মাঝে মঝে মাথা চুলকানো এক ধরনের অধস্তন ভঙ্গি। বাদামী সাহেবরা এই ভঙ্গীটি বড়ো পছন্দ করেন। সাহেব আড়চোখে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন। এই তো আমার হোয়াইট কালার কৃতদাস। এই সময়টায় যিনি জানেন, তিনি সঠিক তৈল প্রদান করে ভবিষ্যতের পথ তৈলাক্ত করেন, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তো লিখেই গেছেন, তৈল এক প্রকার স্নেহজাতীয় পদার্থ। বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। তুমি আমাকে স্নেহ কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। সায়েব যদি অন্যায় বলেন, হে অধস্তন, তুমি প্রতিবাদ করো না। শুধু মাঝে মাঝে, ইয়েস স্যার বলে যাও। ইয়েস স্যারের সুপ্রয়োগে পঙ্গুও কেরিয়ারের সুউচ্চ পর্বত লংঘন করতে পারেন। কত নজির চাই। তিনি বললেন, ইউ আর এ ফুল। তুমি বল ইয়েস স্যার। তিনি বললেন, আপনি একটা অপদার্থ, গাধা। তুমি বল, ইয়েস স্যার। এবম্বিধ আচরণে কত অপদার্থ গর্দভ সুউচ্চ পদে আহোরণ করে স্বাধীন-চেতা, আদর্শবাদী পদার্থের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। নিজেকে

পদার্থ প্রমাণ করে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা মূর্খের বিলাসিতা। বুদ্ধিমান গাড়ি-বাড়ি করে। ফুটবলের মত স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করে। একটু ছোট হলে যদি বিরাট হওয়া যায়, তা হলে অত মর্মবেদনা কেন? ক্ষমতাশীল মানুষ যদি শুয়োরের বাচ্চা বলেন, তাহলেই কি তুমি জেনুইন শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেলে! তোমারও তো একটা এলাকা আছে, যেখানে তুমি মানুষ, অন্যেরা শূকরশাবক। আলো আর ছায়ার মত এই তুমি মানুষ, এই তুমি শূকর তনয়। থিয়েটারের স্টেজ। চরিত্রের ওপর আলোর ফোকাস পড়ছে। কখনও নীল, কখনও লাল।

ভাদুড়ী চক্রবর্তীকে বললেন, কি বড় সায়েবের কাছে খুব ঝাড় খেয়ে এলে?

চক্রবর্তী বললেন, আরে ভাই আন্ডার সেক্রেটারী ডেপুটির কাছে সকালে খুব ঝাড় খেয়েছে। ডেপুটি খেয়েছে জয়েন্টের কাছে। জয়েন্ট খেয়েছে সেক্রেটারীর কাছে। সেক্রেটারী খেয়েছে মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী খেয়েছে গিন্নির কাছে!

গিন্নির কাছে?

হ্যাঁ রে ভাই। সকালে খুব ঝাড় দিয়েছে।

চার্লির ছবির মত। হেড বাটলার অ্যাসিসটেন্টকে লাথি ঝাড়ল, সেই লাথি রিলে হতে হতে চলে গেল ডোরকিপারের পাছায়। ছিট্‌কে পড়ল রাস্তায়।

কোন মানুষই স্বাধীন নয়। সংসারী মানুষ তো আদপেই নয়। যিনি সন্ন্যাসী তিনি কোনও সঙ্ঘ বা সংগঠনের দাস। কোন রাষ্ট্রও পুরোপুরি স্বাধীন নয়। স্মল পাওয়ার বিগ পাওয়ারের ধামা ধরে থাকতে বাধ্য হয়। তা না হলে যে কোনও সময়ে অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

উপার্জনের জন্যে জীবিকার বাজারে মানুষ নিজেকে নিলামে চাপায়। আর তখনই সে হয়ে যায় দাস আমি। যত বড় চাকরিই হোক। একবার লিডেন সাহেব ক্ষুণ্ণ হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ক্ষোভের কারণ, নতুন রাজধানীতে মানুষের শ্রেণী-বিন্যাস হয়েছে উপার্জন অনুসারে। যাঁদের বেশি আয়, তাঁরা

থাকবেন এ সেক্টারে, এইভাবে ধাপে ধাপে বি সি ডি। জাতিভেদ, বর্ণভেদ কাগজে কলমে উঠে গেলেও আর এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে, যার মূলে আছে উপার্জনভেদ।

যে কোনও শিল্প-শহরেই এই নতুন বর্ণভেদ তৈরি হয়েছে। পদমর্যাদা অনুসারে মানুষের কোয়ারেণ্টাইন। মেলামেশার ব্যাপারেও পদমর্যাদার বাধা। অফিসারস ক্লাব, অফিসারস ক্যান্টিন। সেখানে ইতর জনের প্রবেশ নিষেধ। এ কি জ্বালা! ছিলাম উচ্চবর্ণের মানুষ। লেখাপড়াতেও তেমন খারাপ ছিলাম না। বংশমর্যাদাও ছিল। তেমন করিৎকর্মা হতে পারিনি বলে ইস্পাত কারখানার ফোরম্যান। কোয়ার্টার জুটেছে সি সেক্টারে। কাজকর্মেও চৌখস। তবু আমি সি ক্লাস। এ ক্লাসের ব্রাহ্মণরা ব্রাত্য। ওঁদের ক্যান্টিনে গ্রিলড চিকেন হলে আমাদের ক্যান্টিনে ঘুগনি, আলুর দম।

কোনও কোনও অফিসে ল্যাভেটরির মাথায় লেখা আছে, গেজেটেড অফিসারস। সেখানে জনৈক হোমরাচোমরা পুঁই পুঁই পুঁই করে শিস দিতে দিতে জলবিয়োগ শুরু করলেন। ঝুল পাঁচিলের পাশে উঁচিয়ে আছে বকের মত গলা। হঠাৎ পাশের দিকে নজর চলে গেল। অচেনা কে একজন পাশের আড়ালে একই কর্মে ব্যস্ত। নিজের ত্যাগ বন্ধ রেখে তিনি একধাপ পিছিয়ে এলেন। ব্যাটা যদি ননগেজেটেড হয়। গেজেটেড মলমূত্র আর ননগেজেটেড মলমূত্রের জাত আলাদা। তিনি যেই শেষ করলেন, ইনি প্রশ্ন করলেন, আর ইউ গেজেটেড?

পা ফাঁক করে নেচে নেচে প্যাণ্টের ফাস্টনার আঁটতে আঁটতে তিনি বললেন, অ. সিওর। কান্ট ইউ রেকগনাইজ মি ফ্রম দি স্মেল অফ মাই ইউরিন?

বড়সায়েব ট্যুরে চলেছেন! সঙ্গে চলেছেন কয়েকজন কুঁচো সায়েব। সার্কিট হাউসে পদার্পণ করেই তিনি গরম জল, চা, চিকেনের ফরমায়েশ পেশ করে কুঁচোদের বললেন, যান আপনারা আপনাদের মত একটা হোটেল-টোটেল দেখে নিন। এতক্ষণ একই জিপে এঁরা এসেছেন। গল্পগুজবও হয়েছে। মাঝে-মধ্যে

রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা, সিঙাড়া, কৃষ্ণনগর হলে সরপুরিয়া, শক্তিগড় হলে ল্যাংচা, গোবরডাঙ্গা হলে কাঁচাগোল্লা, মুর্শিদাবাদ হলে ছানাবড়া সেবন হয়েছে। সার্কিট হাউসে অনেক ঘর কিন্তু চাকরিতে যারা নীচ জাতীয় তাদের সঙ্গে সহবাস চলে না। নীচ জাতীয়া মহিলার সঙ্গে সহবাস কিন্তু শাস্ত্রসম্মত। আমাদের শাস্ত্রে আছে, বিদেশী শাস্ত্রেও সেই এক বিধি। সাদা সায়েবরা এদেশের সেই প্রজাতি রেখে গেছেন।

মাঝরাতে বিনা নোটিশে সপার্ষদ মন্ত্রী এসে হাজির হলেন। সবকটা ঘরই তাঁর লাগবে। সায়েব তাঁর লটবহর, গেলাসে হাবুডুবু নকল দাঁতসহ, সার্কিট হাউসের হাতায় অর্জুন গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। রাত কেটে গেল তারা গুনে।

ছোট করে দাও, চেপে দাও, দুমড়ে মুচড়ে দাও। ক্ষুদ্র মানুষ কল্পনায় বিশাল হতে চায়। মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় একে বলে বিপরীত ইচ্ছা। ক্ষুদ্র করে রাখার চেষ্টা হলেই প্রতিরোধ তৈরি হবে। বিশালের কল্পনা আসবে। গাছের ফল ন্যাকড়া বেঁধে রাখলে বড় হয়। মানুষ সহসা বড় হতে পারে না। জগতাতীতে সে পূর্ণতা খোঁজে। অরণ্যদেবকে ভালবেসে ফেলে। আসলে যা হয়, সব মানুষের ক্ষেত্রেই যা সত্য, সে স্যাডিস্ট হয়ে যায়। পরকে মারার ইচ্ছে পূর্ণ হলে, নিজে মার খাবার ইচ্ছে অবচেতনে লুকিয়ে বসে থাকে। যুদ্ধের নিয়ম হল কিল অর বি কিল্‌ড। পরের দাসত্বে মানুষ মাধুর্য খুঁজে পায় একই কারণে। নিপীড়নের ইচ্ছা নিপীড়িতে তৃপ্তি খুঁজে পায়। খুব ঝেড়েছির মত খুব ঝাড় খেয়েছিতেও একই আনন্দ। প্রেম প্রীতি ভালবাসা এক ধরনের ক্লান্তির আকাঙ্খা। বৃদ্ধ মাস্তান যেমন হৃতবল হয়ে, কপালে তিলক সেবা করে, ভাগবত পাঠের আসরে বসে, দুলে দুলে কীর্তন শোনে। লোকে ভাবে এত প্রেম ছিল কোথায়! দাঁত পড়ে গেছে তাই নিরামিষাশী। চোখে ভাল দেখতে পাই না তাই জগৎ সুন্দর। ঘাড় মটকাবার শক্তি নেই তাই ঃ

হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কী হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু-মন-জুড়ে॥

রাতিদিন পোড়ে মন সোয়াৎ না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥

প্রেম আবার কি ? একপক্ষে অধিকার বোধ আর একপক্ষে আত্ম বিসর্জন। আমাতে আত্মসমর্পণ কর আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। স্বামী স্ত্রীকে বললেন, যা বলব তাই শুনবে, প্রতিবাদ করবে না, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। তুমি আমার পেট ডগ। বিছানা পাবে, বালিশ পাবে, সিল্ক পাবে, সোনা পাবে। পিতা পুত্রকে বললেন, অবাধ্য হবে না। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। মালিক শ্রমিককে বললেন, নতজানু হও, বোনাস পাবে। চেলারা নেতাকে বললেন, আমাদের কালটিভেট কর গুরু তবেই গদি থাকবে। আইনের প্রভুরা বললেন, সন্তুষ্ট রাখুন, বেআইনী চালাতে দোব। স্বর্গ কোথায় ? পলাতকের দুর্বলতায়। এরিক ফ্রমকে টেনে আনি, The power of the one to whom one submits is inflated, may he be a person or a God, he is everything. I am nothing except in as much as I am part of him.
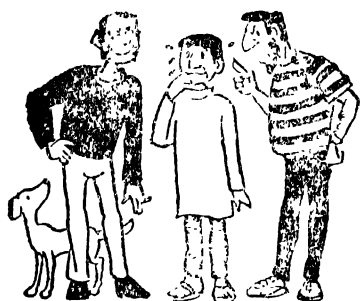
তাসের ঘর

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসছে উত্তর থেকে। ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্যদিন এই সময়টায় শশাঙ্কবাবু সাধারণত বেড়াতে যান। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। বড় রাস্তা পেরিয়ে আবার গলি। গলির মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে সন্ধের মুখেই ফিরে আসেন বাড়ির দরজায়। বৃদ্ধ মানুষ। সকাল-বিকেল না বেড়ালে ভালো হজম হয় না। এই বয়সে লোভটাও বাড়ে। মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা সেটা খেয়ে ফেলেন। তার পর পেট যখন হাঁসফাঁস করে তখন প্রতিজ্ঞা করেন, না, আর কখনো অখাদ্য-কুখাদ্য খাব না। আজ সেইরকম একটা দিন। সকালে মেঘলা দেখে দুটো চপ খেয়েছিলেন। দুপুরে খেয়েছেন খিচুড়ি আর সেঁকা পাঁপড়। একটু আগে খেয়েছেন চা আর নিমকি। এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। অন্যদিন এক মাইল বেড়ালে আজ তিন মাইল বেড়ানো উচিত।

ঘরের একটা জানালা খুলে শশাঙ্কবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। আরো কালো হয়ে এসেছে আকাশ। চারপাশ যেন মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছাতা নিয়ে বেরনো যেত যদি দমকা হাওয়া না থাকত। জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন। সন্ধের আগেই ঘরে অন্ধকার

নেমেছে। আলোটা জ্বালালেও হয়, না জ্বালালেও হয়। সারা দুপুর অনেক পড়েছেন। ঝাপসা আলোয় পায়চারি ভাল। ঘরে ঘুরে ঘুরেই তিন মাইল বেড়িয়ে নিতে হবে।

একটা ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের তলায় শশাঙ্কবাবু থাকেন। স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে জামসেদপুরে। ছেলের বিয়ে হয়নি। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বেশি দেরি করতে চান না। বৃদ্ধ বয়সে একা থাকতেও ভাল লাগে না। সারাদিন নিঃসঙ্গ। বই, কাগজ, ছবি, আকাশ, ফুলগাছের টব, বারান্দা, রাস্তা, আশপাশের বাড়ি—এই তো তার জগৎ! এর বাইরে তো যাবার উপায় নেই। কাঁহাতক ভালো লাগে। ঠিকে একজন কাজের লোক আছে। ফুড়ুক করে আসে, ফুড়ুক করে পালিয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে একটা ছোঁচা বেড়াল আসে সঙ্গ দিতে। তিনি তাকে দুধ রুটি মাছ খাইয়ে তোয়াজ করেন। যদি পোষ মেনে যায়। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ গোল হয়ে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তাঁর একটু মজা করার ইচ্ছে হল! ঘুরে ঘুরে ইংরিজি অক্ষর লিখতে শুরু করলেন—এ বি সি ও আই এম ডবলু। রাত আটটা কি নটার সময় সুধী আসবে। ছেলের নাম সুধী। তার আগে অবশ্য রান্নাবান্না করার মহিলাটি এসে যাবে। মুখে পান। খোঁপাটা মাথার পেছন দিকে উঁচু করে তুলে বাঁধা। মহিলাটির চালচলন কেমন কেমন হলেও রাঁধে ভাল। কামাই করে না।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল! এমন সময় কারুর তো আসার কথা নয়। আজকাল পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে দরজার কড়া নড়লে, কি বেল বাজলে ভয় করে। একা থাকেন। শরীরে তেমন শক্তিও নেই। অস্ত্রও রাখেন না। ইদানিং ফ্ল্যাট বাড়িতেই তো নানারকম খুনখারাপি হচ্ছে। দরজার ম্যাজিক আইও নেই যে আগন্তুককে দেখে নেবেন।

শশাঙ্কবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কে?

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে জবাব এল—আমি।

—কে সন্ধ্যা?

—না আমি।

—তবে কি রমা?

রমা হল নিচের ফ্ল্যাটের পরেশবাবুর মেয়ে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, তবে ছেলের বউ করা চলে কিনা ভাবতে হবে।

—না আমি।

শশাঙ্কবাবু খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। মহিলা কণ্ঠ, অথচ সন্ধ্যা নয়, রমা নয়। তাহলে কে? কোন পুরুষ মহিলার গলা নকল করছে বলে মনে হয় না। ওপাশে নির্ভেজাল কোন মহিলাই দাঁড়িয়ে আছেন। একমাত্র মহিলারাই কে জিজ্ঞেস করলে আমি আমি করেন। তাছাড়া শাড়ির খসখস শুনতে পাচ্ছেন।

—দয়া করে নামটা বলবেন? শশাঙ্কবাবু সরাসরি নাম জিজ্ঞেস করলেন।

—দরজাটা খুলুন। নাম বললে চিনতে পারবেন না।

—না না, আজকাল দিনকাল ভাল নয়। পরিচয় না দিলে দরজা খুলব না।

—আ গেল যা। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়েছেলের মত ভয়ে মরছে দ্যাখো!

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন, চোর ডাকাত নয়, আদি অকৃত্রিম গেরস্থ মহিলা। সাহস করে দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার সামনে মোটাসোটা মাঝবয়সী এক মহিলা। পাকা পেয়ারার মত রঙ। হাতে ঝুলছে পেটমোটা চটের লেডিজ ব্যাগ। মহিলা সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কার ঠুকেই বললেন,

—বিপদে পড়ে এসেছি। চিনতে পারছেন কিনা জানি না। পেছনের ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকি। দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে। একদিন বাসে ওঠার সময় আমাকে ধাক্কা মেরে নিজেই টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধরেছিলুম বলে মাথাটা পেছনের চাকায় যায়নি।

মনে পড়ছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন। কি বিপদ বলুন ?

মহিলা ভেতরে এসে দরজার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলেন,

—এখন কারুর আসার সম্ভাবনা আছে ?

—আজ্ঞে না।

—বেশ—খুব ভাল কথা। আপনার শোবার ঘরে একবার চলুন তো।

শশাঙ্কবাবু মহিলার অসঙ্কোচ ব্যবহারে প্রথম থেকেই হক-চকিয়ে গিয়েছিলেন, এইবার একেবারে অভিভূত হয়ে বললেন,

—না না শোবার ঘরে কেন ? বসার ঘরে বসাই তো ভালো।

—বসতে আমি আসিনি। এসেছি কাজে। সে কাজটা শোবার ঘরে না গেলে হবে না।

কথা বলতে বলতেই মহিলা শোবার ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। শশাঙ্কবাবু খুব অবাক হলেন। কোনটা শোবার ঘর মহিলার জানা। হাত ধরে টেনে আনতেও পারছেন না। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। শোবার ঘরেই সংসারের যথাসর্বস্ব। দুপাশে দুটো খাট। একটা নিজের অন্যটা ছেলের। দুজনে একই ঘরে শোন। শশাঙ্কবাবু একা শুতে পারেন না। ঘুম আসে না, ভয় ভয় করে। দরজার পাশে আলোর সুইচ। জ্বালাতে যাচ্ছিলেন। মহিলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—

—খবরদার না। আলো জ্বালালেই সব মাটি হয়ে যাবে।

শশাঙ্কবাবু হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—কি করতে চাইছেন আপনি ? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহিলা শশাঙ্কবাবুর বালিশ থেকে তোয়ালেটা তুলে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন,

—ওয়াচ। ওয়াচ করতে চাইছি।

—তার মানে ? কাকে ওয়াচ করবেন ?

—ওই যে, ও বাড়ির বুড়োটাকে। আমার স্বামী।

শশাঙ্কবাবুকে আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে উত্তর দিকের জানালার খড়খড়িটা ফাঁক করে দেখতে বললেন,

—হুঁ, আলো জ্বালা হয়নি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। কতক্ষণ তুমি আলো না জ্বেলে থাকবে। এই আমি বসলুম খাটের কিনারায়।

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, মহিলা তার খাটের পাশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। একটা পা তুলে দিয়েছেন মাথার বালিশে। কিছু বলতেও পারছেন না চক্ষুলজ্জায়। অথচ প্রায় অপরিচিতা এক মহিলা একেবারে বিছানায় গিয়ে বসবেন এটাও বরদাস্ত করা যায় না।

ছেলের খাটে বসে ব্যাপারটাকে একটু পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন,

—ব্যাপারটা কি ?

—ব্যাপার ? বুড়োকে ঘোড়া-রোগে ধরেছে।

—বুড়ো কাকে বলছেন, আমাকে ?

—ছিঃ, আপনাকে কোন সাহসে বলব ? বলছি আমার কত্তাকে। সেই কাঁচখেকো দেবতাটিকে।

—তার মানে ?

—তাহলে একটু ভেঙেই বলি। তার আগে জিজ্ঞেস করি, চায়ের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা আছে ?

—ব্যবস্থা আছে, করার লোক নেই।

—একটু চা না খেলে ঠাণ্ডায় যে মরে যাচ্ছি। আমি করলে আপত্তি আছে ?

—আপত্তি নেই, তবে সেটা কি ভাল দেখাবে।

—ওঃ বাবা। আজকাল আবার ভাল-মন্দর অত বিচার আছে নাকি ! চলুন কোথায় কি আছে দেখে নি।

চা তৈরি হল। শশাঙ্কবাবু বিস্কুট বের করলেন। বসার ঘরেই চা-পর্ব শুরু হল। মহিলা চা খেতে খেতে নিজেকেই নিজে তারিফ করলেন,

—চা-টা বেশ করেছি, কি বলেন ?

—হ্যাঁ বেশ হয়েছে।

—তাও তো মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

চা খেতে খেতে মহিলা যা বললেন, স্বামী ঠিকেদারী করেন। পয়সাকড়ি আছে। মহিলা বড় একটি হাসপাতালের নার্স। ছেলেপুলে হয়নি। বছরখানেক হল ভদ্রলোক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়াকে বাড়িতে এনে রেখেছেন। মেয়েটি কলেজে পড়ে। সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই যত অশান্তি। খালি কাপটা টেবিলে রেখে মহিলা বললেন,

—চারদিকে ছি ছি পড়ে গেছে। কান পাতা যাচ্ছে না। নিচের ফ্ল্যাটের নন্দা অনেক কিছু দেখেছে। সেদিন আমার খোঁজে দুপুরবেলা ওপরে উঠেছিল। ওপরে উঠে দেখে, আরে ছি ছি, বুড়োর মুখে আগুন।

শশাঙ্কবাবুর অন্যের পারিবারিক কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। এসব নোংরা ব্যাপারে তাঁর জড়িয়ে পড়তে একদম ইচ্ছে করছিল না। মহিলাকে কোনরকমে বিদায় করতে পারলে তিনি বেঁচে যান। একি উটকো ঝামেলা! শশাঙ্কবাবু চাইলেই তো আর হবে না, মহিলা নিজের মুখে বলছেন,

—অ্যাঁ, যে বয়েসে লোক বনে যেত, সেই বয়েসে তুই ভর দুপুরে একটা ছুঁড়িকে কোলে বসিয়ে মুখে রসগোল্লা গুঁজে দিচ্ছিস ? তাহলে আমার যখন নাইট ডিউটি থাকে তখন তুই কি করিস ? কি শয়তান, কি শয়তান!

মহিলা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। শশাঙ্কবাবু হাঁ করে দেখছেন তাঁর গতিবিধি। আবার শোবার ঘরের দিকে চলেছেন। উত্তরের জানালা দিয়ে তাকালে একটা বারান্দার কিছু অংশ, একটা ঘরের পুরোটাই চোখে পড়ে। খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, আলনা। বারান্দার রেলিং-এ লাল টকটকে একটা সায়ার তলার দিক হাওয়ায় অসভ্যের মত ফুলে ফুলে উড়ছে। খড়খড়ি জানলার পাখি ঈষৎ ফাঁক করে মহিলা নিজের শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,

—মহারাণীর চুল বাঁধা হচ্ছে। আহা যেন অভিসারে যাবেন! মরণ আর কি? বুড়োটা গেল কোথায়, দেখছি না তো।

শশাঙ্কবাবুর খুব ইচ্ছে করছিল ঘটনার নায়িকাকে একবার চোখের দেখা দেখেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলেন। মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,

—শয়তানী আমার মাথা খাবার জন্যে এসেছে। মানুষের উব্‌গার করতে নেই।

—আপনার স্বামীকে বারণ করুন না। বোঝাতে পারছেন না।

—বোঝানো? ঝাঁটাপেটা পর্যন্ত হয়ে গেছে। পুরুষ হল পতঙ্গ। আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো, আর ওটাকেও একবার এখানে এসে দেখে যান। তারপর বলুন তো, আমার কোন জিনিসটা কমতি আছে! আসুন, আসুন।

শশাঙ্কবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। চোখে ক্যাটারাক্ট ফর্ম করেছে। ভাল দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর মনে হল, এই মহিলার তুলনায় ওই মেয়েটির সব কিছুই কম কম—বয়েস কম, মেদ কম। বেশির মধ্যে চুল, শরীরের খাঁজ। সরে এলেন শশাঙ্কবাবু। এইবার তাঁকে বিচারকের রায় দিতে হবে।

—না আপনার চে' সব কিছুই ওনার কম। কেবল চুলটাই যা বড়।

—আরে মশাই, ওই বয়েসে আমার চুলও পাছা ছাড়িয়ে নামত। এখনই না হয় টিকটিকির ন্যাজ হয়ে গেছে। সব পুরুষেরই এক রা, সব শেয়ালের মত। চুল আর বুক দেখেই গলে গেল।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন। সত্যিই তো মেয়েদের ওই বস্তুর প্রতি যৌবনে তিনিও ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। মনটা কেমন হু হু করে উঠত। সেই আকর্ষণের ছিটেফোঁটা বুড়ো শরীরে এখনও পড়ে আছে। হিংসে হলে কি হবে, মেয়েটির চুলের ঢল সত্যিই চোখে পড়ার মত। মাথাটা একপাশে কাত করে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা আলো ঝলমলে ঘরে দীর্ঘকায় স্লিম এক মহিলা, সংসারের এর চে' সুখের

দৃশ্য আর কি আছে। অথচ এই মহিলাটি রাগে জ্বলে যাচ্ছেন।

চটের হাতব্যাগ থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মহিলা চ্যাপ্টা একটি কৌটো বের করে মুখে কিছু পুরলেন। পাশের ঘরের আলোর আভা এ ঘরে এলেও শশাঙ্কবাবু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। শব্দ শুনে মনে হল পান চিবোচ্ছেন।

—পান খাবেন? মিষ্টি মশলা দিয়ে সাজা।

—সন্ধেবেলা পান আর খাবো না। আগে খুব খেতুম। এখন সকালে খাবার পর সুপুরি ছাড়া এক খিলি খাই।

—আমি খুব খাই। ঘুম থেকে উঠে শুরু করি যতক্ষণ না শুতে যাচ্ছি। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। ছেলে নেই পুলে নেই। সংসারটাও পরের হাতে চলে যেতে বসেছে। ফ্রাসট্রেশন, ফ্রাসট্রেশন।

মহিলা চৌকির ওপর বেশ ভালো করে নড়েচড়ে বসতে বসতে খুব ঘরোয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

—ওই খাটে কে শোয়?

—আমার ছেলে।

—আমি যেটায় বসে আছি?

—ওটা আমার।

—একই ঘরে বাপ ছেলে। ছেলের বিয়ে দিতে হবে তো?

—হ্যাঁ, মেয়ে দেখছি।

—বসার ঘরের একপাশে সরে যাবো। অসুবিধের কিছু নেই।

—ছেলের বউ একটু দেখেশুনে করবেন। আজকালকার মেয়েদের ছিরি দেখছেন তো। নিজের বউটিকে তো খেয়ে বসে আছেন। যে বয়সে নিজের বউকে সব চে' বেশি দরকার হয় সেই বয়সেই তো ঘর খালি। এখন লাগছে কেমন একলা একলা?

—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সকলকেই তো যেতে হবে। আগে আর পরে।

শশাঙ্কবাবু শব্দ করে হাসলেন। হেসে অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাওয়া নিঃসঙ্গতাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। মহিলা

শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। জানালার পাখি খুলে চোখ রেখেছেন। পুরো মনযোগটাই ওখানে। চাপা একটা গর্জন শোনা গেল,

—আ-হা-হা, পটের বিবি। মরা মানুষেরও লজ্জা থাকে, উনি শুধু সায়া পরে ঘরময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে। সায়ার রঙ দেখো—লাল, নীল, হলদে, সবুজ। যে জিনিস চাপা থাকবে তার আবার অত রঙের বাহার কি জন্যে? আমাদের আমলে সব সাদা ছিল। এখন আবার লুঙ্গি উঠেছে। বুড়োটা নিশ্চয় ঘরের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে বসে ঊর্বশীর নৃত্য দেখছে। বাড়ি নয় তো বেশ্যালয়।

জানালার পাখি ফেলে দিয়ে মহিলা সোজা হয়ে বসে শশাঙ্ক-বাবুকে প্রশ্ন করলেন.

—আজকাল মেয়েগুলোর কি হয়েছে বলতে পারেন? পুরুষ-দের না হয় ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ানোই চিরকালের স্বভাব। ছুঁড়িগুলোর এই মতিচ্ছন্ন ধরেছে কেন?

শশাঙ্কবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রশ্নের কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। এক সময় বললেন,

—কালের হাওয়া।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধানে, হিসেব করে করে বললেন,

—এক এক বয়সের মেয়েকে এক এক রকম দেখতে। কম বয়েসে এক রূপ, বেশী বয়েসে আর একরকম রূপ। দুটো রূপই ভালো।

মহিলা খাটের ওপর বেশ করে নড়েচড়ে বসলেন। সাবেক আমলের অমন শক্ত খাটও শব্দ করে উঠল। মুখে আর একটু মশলা ফেলতে ফেলতে বললেন,

—রূপসী অ-রূপসীর কথা হচ্ছে না, আমার কথা হল তোয়াজ। ক'টা স্বামী মশাই স্ত্রীকে তোয়াজে রাখতে পারে? সারা জীবন বাবুরা ধামসে যাবেন, বুড়ো বয়েসে চাইবেন স্ত্রীর যৌবন, পাছা ভর্তি চুল, সরু কোমর, টান টান তেল তেল চামড়া,

হাত ভর্তি•••।

শশাঙ্কবাবু আতঙ্কে কেশে উঠলেন এঁর মুখে তো কোন কথাই আটকায় না।

—কাশি হয়েছে দেখছি। আর হবে না! বর্ষায় চারদিক ঢ্যাপ-ঢ্যাপে হয়ে আছে। রক্তের জোরও তো কমছে! বুকে বসেছে?

—না, শুকনো কাশি।

—একটু মালিসটালিস, কেই বা করবে! এই বয়সের বিধবাদের বড় কষ্ট। ওই মড়া কিন্তু বুঝল না, বউ কি জিনিস? এই তো সেবার, অস্থানে বিষফোঁড়া হল। সারারাত ঘুমোতে পারে না। কে সেবা করল? ফুর্তির মেয়ে জুটবে অনেক। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হয় না। কিন্তু সেবার মেয়ে ওই একটাই—বউ। কিল মার, চড় মার, ঝাঁ্যাটা মার, শেষ পর্যন্ত বউ-ই ভরসা। বয়েস তো হল, অনেকের অনেক কেতাই তো দেখলুম, ঘাড়ে পাউডার, চুনট করা ধুতি, বার্নিস করা জুতো, শালীর সঙ্গে রপটারপটি, ভাদ্দর বউয়ের সঙ্গে গা ঘসাঘসি, বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে নুকোচুরির পিরিত, মাসকাবারি মেয়েমানুষ, শেষকালে বুড়ো এসে মরল বউয়ের কোলে—ওগো তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই গো! ঘেন্না ধরে গেল জীবনে।

মহিলা জানালার পাখি ফাঁক করে আর একবার দেখলেন। শশাঙ্কবাবু ভেবেছিলেন কোনও রকম মন্তব্য হবে। না, হল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে এইবার একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তা হলেও সন্ধেটা বেশ কাটল। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। একটা হাই উঠল। দু-হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘরে আলো না জ্বললেও, বারান্দা থেকে আলোর একটা আভা ঘরে এসেছে। একটা আবছা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, হাল্কা রঙের ব্লাউজ। শরীরটা সামান্য ভেঙেচুরে খুব পরিচিত একটা ভঙ্গি তৈরি হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সেও তো এইভাবে শরীর ভাঙত। বয়েস যখন কম ছিল শশাঙ্কবাবু ঠিক এই রকম মুহূর্তে লোভ সামলাতে না পেরে স্ত্রীর কোমর

জড়িয়ে ধরে খাটে উল্টে ফেলে দিতেন। না, না, অতীত অতীতই, প্রাচীন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মনকে দুর্বল করে তোলা ঠিক নয়।

বিছানা থেকে চটের হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা বললেন,

—যাই। গিয়ে সংসারের চুলোয় আগুন ধরাই। মেয়েদের এই জ্বালা, যখন আদর জোটে তখন ফুটকলাই নিয়ে ফোটে। যখন আদর টুটে তখন মুগুর দিয়ে ঠোকে।

শশাঙ্কবাবু পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এলেন। বেঁটে মহিলা, দরজার ছিটকানিতে হাত পাবেন না। ঘাড়ের কাছে সরু সোনার হার চিকচিক করছে আলো পড়ে। গোল-গোল হাতে সাদা শাঁখা। শশাঙ্কবাবু গড়ন-পেটন মানেন। তন্ত্রে এই ধরনের চেহারার যে উল্লেখ আছে তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এই মহিলা লক্ষ্মীমন্ত। ছিটকিনি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন,

—আপনাকে বিয়ে করার পরই কত্তার ভাগ্য ফিরেছে, তাই না?

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন,

—ঠিক ধরেছেন তো। জ্যোতিষ-টোতিষ করেন নাকি?

—তেমন ভাবে করি না, তবে বেকার মানুষ, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

—তাহলে এবার যেদিন আসব কোষ্ঠীটা আনব।

মহিলা বেরোচ্ছেন শশাঙ্কবাবুর কাজের মহিলাটিও ঢুকছে। অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। এ আবার কে! মেয়েটির আজ টান করে চুল বাঁধা। ফেত্তা দিয়ে শাড়ি পড়েছে। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন সাজের ঘটা একটু বেশি। বেশ গুছিয়ে নিজের মত করে কাজ করে, তাই সব বেচাল সহ্য করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গানও গায়। একটু ফিচলেও আছে। এই তো সেদিন, শশাঙ্কবাবুরই সামনেই ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে হাতার পিছন ঢুকিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। কোন সংকোচ নেই। উলটে জিজ্ঞেস করল, 'ঘামাচির পাউডার আছে আপনার কাছে?' পাশ দিয়ে চলে গেলে কেমন একটা যৌনতার আঁচ গায়ে লাগে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তাও মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়।

দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে শশাঙ্কবাবু নিজের ঘরের দিকে

এগোতে এগোতে বললেন,

—মানু, একটু চা করবে নাকি ?

রান্নাঘরের পাশের কলে অনেকখানি কাপড় তুলে মানু পায়ের গোড়ালি ধুচ্ছিল। ভাল দেখতে পান না তবু ক্ষণিকের জন্যে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল শ্যামলা দুটি পায়ের গোছে। সায়ার ঝোলা অংশ, শাড়ির পাড়, নির্জন বারান্দা, ঝিমঝিম বৃষ্টির শব্দ, ভিজে গাছের পাতা দোলানো বাতাস, প্রতিবেশীর রেডিও থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত, নাঃ, জীবন একটা মধুর অনুভূতি। ফুরিয়ে গিয়েও ফুরোতে চায় না! হঠাৎ মনে পড়ল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা।

—মানু আর পা ঘসো না, এবার ক্ষয়ে যাবে।

—রাস্তার যা অবস্থা ঘেন্না করে, ম্যাগো।

—জান তো দাদাবাবু আজ ফিরবে না, কলকাতার বাইরে গেছে।

—জানি, সকালে বলে গেছে আমাকে। তাক থেকে ওই গামছাটা দিন তো। ওটা নয়, ওটা নয়, ওই পাশের লালটা।

—আরে বাবা লাল-নীল বোঝার মত কি আর চোখ আছে আমার। এই নাও ধর।

—বাদাম দিয়ে চিঁড়ে ভাজব, খাবেন ?

শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। মানুর খাবার ইচ্ছে হয়েছে। না বললে নৃশংসতা হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কেন খাবো না ? ভাজ ভাজ, বর্ষায় জমবে ভাল।

মানুকে শোনাতে ইচ্ছে করল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা। এসব কথা হঠাৎ বলা যায় না। নিজেকে সংযত করে রাখলেন। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। মন বড়ো মাতাল হয়েছে। বিবাহিত জীবনের কত অভ্যাস স্ত্রী বিয়োগের পর জোর করে ভুলতে হয়েছে। বাবা! অভ্যাস-দোষ না ছাড়ে চোরে। শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

বিছানায় কাত মেরে শুয়ে পড়লেন শশাঙ্কবাবু। বেডকভারটা একটু কুঁচকে মুচকে গেছে। বালিশের ঢাকাটা একটু ভিজে ভিজে।

চুলের আর তেলের গন্ধ। নাকের কাছে কি একটা সুড়সুড় করছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললেন। গোটাকতক লম্বা চুল আটকে আছে তোয়ালের রোঁয়ায়। বেডকভারের যে জায়গায় মহিলা বসে ছিলেন সেই জায়গাটাও সামান্য ভিজেছে। শাড়িটা বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজেছিল। আলোটা নিবিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধাও মাথায় গন্ধতেল মাখত। সারা ঘরে এইরকম একটা গন্ধ ভেসে বেড়াতো। অনেকদিনের স্মৃতি আবার ভেসে এল। মহিলাশূন্য নীরস সংসারে কিছুক্ষণের জন্যে যেন রসের ধারা বয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু চাদরের ভিজে জায়গাটাও বারকয়েক হাত বুলোলেন। বালিশের ঢাকায় মুখ জুবড়ে নিজের স্ত্রীকে মনে করবার চেষ্টা করলেন। যৌবন, সংসার, ভালবাসা, ঝগড়া, ভাব। শরীরটা মাঝে মাঝেই একটু সঙ্গ চাইত। সুধা সাবধান করত, একটু বুঝে-সুঝে খরচ কর, তাহলে দেরিতে ফতুর হবে। নিজেই কেটে পড়লে, পড়ে রইল শশাঙ্ক। কার কখন তেল ফুরোয়, কে বলতে পারবে বাবা।

একটু বোধ হয় তন্দ্রামতো এসেছিল। মানু ঘরে এসে বলছে,

—একি, চিঁড়ে খাননি কাকাবাবু। আমি যে চা নিয়ে এসেছি। শশাঙ্কবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন।

—আলোটা জ্বাল তো মানু।

ঘরের ওপর আলো লাফিয়ে পড়ল। শশাঙ্কবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন। চোখে ঘুম রয়েছে। সংসারটাকে বেশ ভরাট ভরাট লাগছে। সব যেন ফিরে এসেছে। এ কে? মানু, না সুধা? মানু বললে,

—অবাক হয়ে কি দেখছেন? শরীর খারাপ?

—না. শরীর খারাপ নয়। বিকেলে বেরোতে পারিনি তো সন্ধের দিকে গা-টা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—সব কটা জানালা বন্ধ করে রেখেছেন, গরম লাগছে না?

চায়ের কাপটা খাটের পাশের টেবিলে রাখার জন্যে মানু নিচু হল। পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপার দিকে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল। কুচকুচে কালো চুল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মানু বললে,

—যা বর্ষা নেমেছে, কি করে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছি ?

—বাড়ি ফিরতেই হবে ?

—না ফিরলে আর একজন তো হেদিয়ে মরে যাবে।

—না, তেমন হলে এখানেও তো শোবার ব্যবস্থা আছে।

—দেখি।

মানু চলে গেল। একবার শশাঙ্কবাবুর খুব জ্বর হয়েছিল, মানু একদিন সারারাত জেগে সেবা করেছিল। সন্ধে থেকেই মনটা বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় সে নরখাদক হয়ে যায়। শশাঙ্ক কি সেই বাঘ ? ভাজা মুচমুচে চিঁড়েও এখন পাগলে পাগলে খেতে হয়। দাঁতগুলো বাঁধিয়ে ফেললে কেমন হয় ! মুখের চেহারাটা আবার যুবকদের মত হয়ে যাবে ! চুলে একটু কলপ। আরও যুবক। মন-পাখি কি বুড়িয়ে গেছে ? ভেতরটা আজ বড়ো শিরশির করছে। মানু যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তখন কেমন মনে হল ! না মনটাকে বাঁধতে হবে।

নারী সংসৃতিমূলিকা, অর্গল সুরপুরকের।
চিত্রতমপি নহি দেখহিঁ বুদ্ধিমন্ত ঘনের।

শশাঙ্কবাবু আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিদ্রোহী শরীরটাকে বিছানায় চেপে রাখার ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখি। সেই সায়া, ফুলে ফুলে উড়ছে। সেই মহিলা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব হাত নেড়ে অদৃশ্য কাউকে শাসন করছেন। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। সেই মেয়েটি কোথায় ! অনেকটা মানুর মতই দেখতে। মানুর চেহারার বাঁধনটা এখনও ঠিক আছে। একটু যত্নে থাকলে কত লাগদাঁই হত !

দুই

দুপুরের দিকে মহিলা এলেন। এখনও বেশ চুল আছে। কপালটা তাই ছোট। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে। নাকের ডগাতেও পুঁতির মত ঘামের দানা। নাকের ডগা ঘামলে প্রেমিক হয়। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে মহিলা বললেন,

—যত বর্ষা হচ্ছে তত গরম বাড়ছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে শাড়ির পেছন দিকটা দেখতে দেখতে বললেন,

—চটি পরে বর্ষায় হাঁটা যায় না। কাদা ছিটকেছে ?

শশাঙ্কবাবু দেখলেন। সাদা শাড়ি ভারী শরীরে মোলায়েম হয়ে জড়িয়ে আছে। এখানে-ওখানে সামান্য কাদার ছিটে।

—একটা দুটো ছিটে লেগেছে। একেবারে স্প্রে পেন্টিং হয়ে যায়নি।

—কাদার দাগ ওঠে না বুঝলেন, মনের দাগের মত।

—ছেলে কোথায় ?

—ছেলে বেরিয়েছে।

—আজ আমার অফ ডে। বুড়ো জানে না। প্রথম প্রথম বলত আজ আর বেরিও না সুধা, নাইবা গেলে আজ।

—আপনার নামও সুধা ?

—কেন ?

—আমার স্ত্রীর নামও সুধা ছিল।

—ও। এখন কি বলে জানেন, তুমি বেরোবে না ? না না কামাই করা ঠিক হবে না। দেশের মানুষ সাফার করবে। ওরে আমার দেশ হিতৈষীর বাচ্চারে। চলুন, ঘরে চলুন।

মহিলার এই আদেশের ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগে। তেমন তেমন মেয়ের কৃতদাস হয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায়। মনে পড়ছে, দিগ্বিজয়ী যো শূর হোয়, বহুগুণসাগর তাহিঁ। ভ্রূ-কটাক্ষ নো করত হোয়, তাকো পদতলমাহি। দিগ্বিজয়ী, মহাবলশালী পুরুষ। মেয়ে-ছেলের কটাক্ষপাতে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। মহিষাসুরের বুকে দুর্গার শ্রীচরণ।

—এই নিন। ভুলিনি। কাশিটাকে তো কমাতে হবে। দু আঙুলে নিয়ে শোবার আগে বুকে লাগাবেন। মালিশ নয় শুধু ওপর ওপর লাগিয়ে দেবেন। আর এই নিন খাবার ওষুধ। শোবার আগে এক চামচে, চেটে চেটে। ভাল মানুষের জন্যে করতে ইচ্ছে করে। মিচকে শয়তানটার জন্যে অনেক করেছি, দাম দিলে না।

—আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। হয়ত শুধু শুধুই সন্দেহ করছেন। ভদ্রলোক হয়ত মেয়ের মতোই ভালবাসেন।

—কিই ?

মহিলা খাটের ওপর ধপাস করে বসে, একটি পা বিছানায় রাখলেন।

—মেয়ের মত ? না মেয়েমানুষের মত ? শুনুন তবে, ছেলে-পুলে হচ্ছে না দেখে দুজনেই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালাম। ডাক্তার বললেন, গোলমাল আপনার নয়, আপনার স্বামীর বুঝলেন ব্যাপারটা! ও তো এখন বেপরোয়া। ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, ছোবলালেও মরবে না! এইবার দেখুন।

উত্তেজিত মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ভিউফাইন্ডার বের করলেন, ...নিন, চোখে লাগিয়ে দেখুন।

চোখ লাগিয়েই শশাঙ্কবাবু চমকে উঠলেন। ওরে বাপ! একি! সাপ দেখছেন যেন! জিনিসটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলেন।

—এইসব জিনিস বাড়িতে আসছে কিসের জন্যে ? বলতে পারেন কিসের জন্যে ? সন্দেহ! সাধে সন্দেহ আসে ? মেয়েছেলে হতে পারি, মুখ্যু হতে পারি, তা বলে তো গাধা নই। প্রথম বয়েসে এসবের মানে বোঝা যায়, শেষ বয়সে মরার কালে এত চুলবুলুনি কিসের ? সব ওই ছুঁড়ির জন্যে। বুড়ো মড়া যৌবন ফিরে এসেছে। আমার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। ভালো কথা বললেও খেঁচিয়ে ওঠে। ওই ছুঁড়ি কিছু বললেই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে।

—শশাঙ্কবাবু প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইলেন।

—আজ একেবারে শরতের আকাশ।

—ওসব আকাশ-টাকাশ কবিরা দেখবে। আপনি কি কবি ? একটা পান খাবেন নাকি, জর্দা দিয়ে ?

চৌকো মত একটা পানের ডিবে খুলে পর পর দুটো খিলি মুখে পুরলেন। ফর্সা গাল দুটো ঠেলে উঠল। শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। না বললেই মহিলা সন্দেহ করবেন, দাঁত

নেই, ফোগলা দিগম্বর।

—দিন একটা খাই, অনেকদিন ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। সুধাও গেছে, পানের পাটও উঠে গেছে।

—আর এক সুধা এসে আবার চালু করে দিচ্ছে। নিন। হাত পাতুন, একটু জর্দা দিই।

—না না জর্দা থাক। মাথা-টাথা ঘুরে পড়ে যাব।

—আহা, কচি খোকা। ঘুরে যায় যাবে, জল থাবড়ে দোব। জর্দার জন্যেই তো পান।

পান, পানের পিক, জর্দা সব ভেদ করে কথা আসছে জড়িয়ে জড়িয়ে। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, পিক ফেলবেন। শশাঙ্কবাবু বুঝতে পেরে বললেন,

—আসুন কোথায় ফেলবেন দেখিয়ে দিই। নর্দমার কাছে এসে ডান হাতে কাপড়ের সামনের দিকটা পুরুষ্টু দুই উরুর মধ্যে ঠেসে ধরে, মুখটা ছুঁচ মতো করে পোয়াটাক পিক ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

—বাড়িটা নতুন, তবে জায়গা বড়ো কম। আর কি হবে, এরপর আর দাঁড়াবার জায়গাও মিলবে না।

ঘরে ঢুকে নিজেই রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখার চলন বাড়িয়ে দিলেন। খাটের ওপর বসতে বসতে বললেন,

—বেশ শান্তির জায়গা। এক ছুতোর মিস্ত্রীর হাতে পড়ে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।

—কে ছুতার মিস্ত্রী ?

—ওই হল, কনট্র্যাকটারও যা, মিস্ত্রীও তাই। আপনার বউটি এত কম বয়সে খসে গেল কি করে ? এমন সুখের সংসার সহ্য হল না বুঝি ?

—লিভার। লিভারটা নষ্ট করে ফেললে। খালি পেটে কাপ কাপ চা, ঘুরতে ফিরতে মুঠো মুঠো চানাচুর। মেয়েদের স্বভাব জানেন তো, একগুঁয়ে অবুঝ, ভালো কথা কানে ঢোকে না।

—খবরদার বউ নেই বলে যা খুশি তার নামে বলে যাবেন, সেটি হতে দেব না। কিপটেমি করেছিলেন। ভালো করে চিকিৎসা

করাননি। বিছানায় শুধু শুলেই হয় না, মাঝে মাঝে রোদেও দিতে হয়।

—চিকিৎসা করাইনি মানে? অ্যালো, হোমিও, কোবরেজি, টোটকা কোনটা বাদ গেছে! নিজে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে ফটিক ঠাকুরের দৈব ওষুধও এনেছি। থাকবে না, যে যাবে তাকে আটকে রাখবে কে?

শশাঙ্কবাবুর গলাটা ধরে এল। চোখ ছলছল করছে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন।

—সেকি চোখে জল এসে গেল! ভীষণ দুর্বল মানুষ তো? ওই পাষণ্ডটাকে দেখে শিখুন। একচোখে কান্না আর এক চোখে হাসি।

—বয়েস হচ্ছে তো? পুরনো কথা মনে পড়লেই চোখে জল এসে যায়। দুখের দিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে গেল, সুখের দিনে রইল না। সুধাকে আজকাল বড্ড মনে পড়ে যায়। ভেবে-ছিলুম ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ি কাশীতে গিয়ে থাকব। তা আর হল না। একলাই যেতে হবে। কত সব ছোট ছোট সাধ আহ্লাদ ছিল, যখন মেটাবার মত অবস্থা এল, সব ফাঁকা। ছেলের রোজগার, ভালো জামাই, কিছুই সহ্য হল না। হাসতে হাসতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আসছ তো?

টেবিলে মাথা রেখে সুধার শোকে শশাঙ্ক ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলেন। মহিলার চোখেও জল এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শশাঙ্কর মাথার পেছন দিকের কাঁচা-পাকা চুলে হাত রাখলেন। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল শশাঙ্কর ঘাড়ে এসে পড়ল। আর এক সুধা শান্ত করার জন্যে কিছু বলতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিষম। পানের কুচি, জর্দার টুকরো শ্বাসনালীতে। দমকা কাশি। মাথার পেছনে রাখা হাত লাফিয়ে উঠছে।

শশাঙ্ক মাথা তুললেন, মহিলার হাত মাথা থেকে খসে, কাঁধ ছুঁয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে গেল। জোর বিষম। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। একে ফর্সা মানুষ। শশাঙ্ক হাত ধরে খাটে বসিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধার বিষম লাগলে মাথার তালুতে চাঁটা

মারতেন। ভালো দাওয়াই। এই সুধার মাথায় কি থাপ্পড় মারা যাবে? যা থাকে বরাতে। শশাঙ্ক ব্রহ্মতালুতে থাবড়া মারতে লাগলেন, দু'চারবার ফুঁও লাগালেন। সিঁথির কাছে সিঁদুরের রেখা বয়েসে চওড়া হয়েছে, চুলের গোড়ায় সাদার ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের মাথা দেখলেই বোঝা যায় কটা ঝড় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। ভীষণ মায়া হল শশাঙ্কর। জীবনে জীবনে ঠোকাঠুকি কবে যে শেষ হবে!

—দাঁড়ান এক গেলাস জল নিয়ে আসি।

শুধু জল নয়, একটা তোয়ালেও ভিজিয়ে আনলেন।

—নিন, মুখটা বেশ করে মুছে ফেলুন। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। উঁহু ওভাবে নয়, জলটা ধীরে ধীরে খান, তা না হলে আবার বিষম লেগে যাবে।

বুকের ওপর থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শশাঙ্কর মনে হচ্ছিল ভিজে তোয়ালে দিয়ে নিজে হাতে মুছিয়ে দেন।

—একটু না হয় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ুন। না না, সংকোচের কোন কারণ নেই। আমি পাশের বসার ঘরে চলে যাচ্ছি।

—কেন, আপনিও ছেলের খাটে শুয়ে পড়ুন। এই বয়েসে খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়।

—আপনার অসুবিধে হবে।

—অবাক করলেন মশাই। আপনার বাড়িতে আমি তো একটা উৎপাত। আমার জন্যে কষ্ট করে সারা দুপুর ঠায় বসে থাকবেন!

—না বসে থাকব কেন? ও ঘরে গিয়ে কাত হয়ে থাকব।

—কেন, এ ঘরে থাকলে কি চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে?

—এঃ ছি ছি, এই বয়েসে চরিত্র বলে কিছু থাকে নাকি? সবই তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তাহলে জানালার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখুন তো।

মহিলা আবার কেশে উঠলেন। বিষমের রেশ এখনও লেগে আছে।

—দেখছি দেখছি, আপনি পাশ ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। আর এক গেলাস জল?

—না আর জল লাগবে না।

শশাঙ্ক পাখি ফাঁক করে ও বাড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। বারান্দার রেলিং-এ দুহাতের কনুইয়ে ভর রেখে কত্তা দাঁড়িয়ে। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, ছাপা লুঙ্গি। মাথার সামনে ওলটানো ফুলকো চুল। কপালের দুপাশ টাকে খেয়ে গেছে। হাতের আর কাঁধের গুলি দেখলেই মনে হয় শরীরে এখনও বেশ শক্তি। এক ঘুষিতে শশাঙ্ক কাত। পাশেই সেই মেয়েটি। নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। এলোচুল মাথার দুপাশ দিয়ে সামনে ঝুলছে। চুড়িপরা একটা হাত কত্তার পিঠে। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে পাখিটা বন্ধ করে দিলেন। এই দিকেই যেন চেয়ে আছেন। যদি দেখে ফেলেন।

—কি দেখলেন ?

শশাঙ্ক তোতলাতে তোতলাতে বললেন,—বারান্দাতেই দুজনে দাঁড়িয়ে। বাপ-মেয়েও বলা যায়, স্বামী-স্ত্রীও বলা যায়, বয়েসের ডিফারেন্সটা না ধরলে।

—বাপ-মেয়ে ! কই দেখি।

শুয়ে শুয়েই শরীরটাকে ঘুরিয়ে জানালার পাখিতে চোখ রাখলেন।

—বাঃ, বাঃ, বা ভাই। বেড়ে হচ্ছে ! প্রকৃতি দেখে শরীরে প্রেম আনা হচ্ছে। যাতিলে জামাই রুটি না খায়। রাত্রি হইলে জামাই ঢেকশেল চাটিতে যায়। মুখে আগুন তোমার। এইবার আমি যদি এই মানুষটাকে জড়িয়ে ধরি। কেমন !

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি সরে গেলেন ছেলের খাটের দিকে।

—এত প্রেম ছিল কোথায় ? নিজের বউয়ের বেলায় সব শুকিয়ে যায়, অন্যের বেলায় উথলে ওঠে। অন্য মেয়েছেলে দেখলেই আপনারা এত চুলবুল করেন কেন বলতে পারেন ?

শশাঙ্ক শুয়ে শুয়ে বললেন,—সবাই কি আর করে ? এক এক জনের এক এক স্বভাব। কেউ কেউ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। পাগল হয়ে যায়।

—পাগলামি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। হুট করে বাড়িতে ঢুকে

দুজনের পিরিত চটকে দেবার সে উপায় রাখেনি। দরজায় কড়া নাড়লেই কত্তা অমনি লুঙ্গি সামলে জপে বসে যাবেন। ছুঁড়ি গিয়ে ঢুকবেন বাথরুমে। আমি এই জানলাটা খুলে এখান থেকেই চিৎকার করব, এই যে দাদু কেমন হচ্ছে, তোমাদের যম সব দেখছে।

—এই না।

শশাঙ্ক ধড়মড় করে উঠে জানালার ছিটকিনির দিকে মহিলার বাড়ানো হাত চেপে ধরলেন। দুজনে চোখাচোখি হল।

—আমাকে বিপদে ফেলবেন না। এই সব নোংরা ব্যাপারে একবার জড়িয়ে গেলে, লোক হাসাহাসি হবে।

শশাঙ্ক হাত ধরে টেনে মহিলাকে চিত করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

—উত্তেজনায় কোন কাজ করা ঠিক নয়। যা করতে হবে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। ভগবানই রাস্তা বাতলে দেবেন।

শশাঙ্ক ছেলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলেন। বেশ লাগল। পুরনো একটা অনুভূতি ফিরে এল। স্ত্রীকে বেশ লাগত। পরস্ত্রীকে যেন আরও ভালো লাগল। না না, এ ভালো লাগা ঠিক নয়। খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। শশাঙ্ক সামালকে।

শশাঙ্ক বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। ভাতঘুম। ঘড়িতে চারটে বাজছে। চোখ মেলে তাকালেন। বাইরে মেঘ ভাঙা রোদ। একখণ্ড নীল আকাশে শরতের টুকরো মেঘ। উঠে বসলেন। সেই সুধা থাকলে এখন চায়ের জল বসত। এই সুধা খুব ঘুমোচ্ছে। শরীরটা শিথিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, মুখটা প্রশান্ত। কোন রাগ বিরক্তি অশান্তির চিহ্ন নেই। ঘুমে সব মোলায়েম। অল্প বয়সে বেশ ধারাল মুখই ছিল। বয়সে তীক্ষ্নতা একটু কমেছে। তা হলেও বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে। লিপস্টিকের মত পানের লাল দাগ। ধবধবে একটা পা আর একটা পায়ের ওপর আড় হয়ে

আছে। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে। চিকন চিকন দু-গাছা সোনার চুড়ি চিকচিক করছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে শাড়ি। গলার কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। বুকের ভার শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে।

হেই মাঝি। জোয়ার আসছে।

বিলেতে মেমসাহেবরা মুখ চুম্বন করে। যৌবনে একটা বই হাতে এসেছিল, আর্ট অফ কিসিং।

এই বুড়ো বি কেয়ারফুল। মক্ষীবয়টি সাহদ পরো পংখা গয়ে লপটাই। মক্ষী ঝটপটায় শিরধুনে, লালাচ বুরি দালাই। লোভই এই সংসারে পতনের একমাত্র কারণ। দেখ শশাঙ্ক মৌমাছির হাল। মধুতে বসলেই পাখা দুটো আটকে যায়। মৃত্যু। যা করবে ভেবেচিন্তে করবে।

শশাঙ্ক রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপালেন। অন্যদিন এক কাপ, আজ দুকাপ। শূন্য বাড়িটা বেশ ভরাট ভরাট লাগছে আজ। দুকাপ চা হাতে নিয়ে শশাঙ্ক আবার শোবার ঘরে এলেন। মহিলা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। শান্তি আর ঘুম হাত মিলিয়ে চলে।

—এই যে শুনছেন, উঠুন, চা এসেছে। এই যে। সুধা সুধা। কতদিন এই নাম ধরে ডেকেছেন। উঠতে বসতে, ঘুরতে ফিরতে। কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

—সুধা, সুধা, চা।

—সুধা চোখ মেলে তাকালেন।

—উঠুন উঠুন, চা এসেছে।

—অ্যাঁ, সকাল হয়ে গেছে?

—না, সকাল নয় বিকেল। খুব ঘুমিয়েছেন। কেমন লাগছে আপনার?

চায়ের কাপটা সুধার হাতে দিলেন। কাপড়চোপড় সব এলোমেলো, আলুথালু চেহারা। এই অবস্থায় কেউ যদি দেখে ফেলে কি যে ভাববে!

—আপনি একবারও দেখেছেন?

—কি দেখেছি ?

—হা ভগবান ! ও বাড়ির সেই চরিত্রহীন বুড়োটা ?

—না তো ?

একটা কাজের ভার দিলুম। ব্যাটাছেলেদের মত অকর্মা পৃথিবীতে খুব কমই দেখেছি।

শশাঙ্কর সেই কথামৃতের গল্পটা মনে পড়ল। এক জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে, লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি। হঠাৎ জিভ আটকে সমাধি হয়ে গেল। সবাই ভাবলে যে ভাগ্যবানের মোক্ষলাভ হল। ওমা যেই জ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি। মহিলারও সেই এক অবস্থা। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, মহিলা পাখি ফাঁক করে দেখতে লাগলেন।

—এই যে দেখে যান, দেখে যান, আপনাদের কাণ্ড দেখে যান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শশাঙ্ক এগিয়ে গেলেন। মাথাটা নিচু করছেন মহিলাও মাথা তুলছেন। কপালে আর মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

—লাগল তো ?

—শশাঙ্ক বললেন, না না, এত সামান্য লাগাকে লাগা বলে না।

চশমাটা নাকের ডগায় হেলে গেছে। চুলের তেলে কাচ ঝাপসা। শশাঙ্ক অস্পষ্ট হলেও ওই বাড়ির শোবার ঘরে পুরুষজাতির কাণ্ড দেখে সত্যিই অবাক হলেন। কত্তা মেঝেতে থেবড়ে বসে আছেন, মেয়েটি পেছন দিক হতে গলা জড়িয়ে আছে। কত্তা পিঠে ফেলে দোল দোল করছেন। ছেলেবেলায় মার পিঠে চেপে শশাঙ্ক এইভাবে দোল খেতেন। মা বলতেন দোল দোল দোল দোল, খোকা দোলে বোকা দোলে, দোল দোল দোল দোল।

—মনে হয় ব্যায়াম করছেন। এই বয়েসে শির-ফির টেনে থাকে। বারবেলের বদলে ওই মেয়েটিকেই ওজন হিসেবে ব্যবহার করছেন। ফিজিওথেরাপি। অনেকে মোটা বই মাথার ওপর তুলে কাঁধের একসারসাইজ করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যায়ামই হচ্ছে। ফিজিওথেরাপি নয়, সেই থেরাপি হচ্ছে! আমার ইচ্ছে করছে এখুনি গিয়ে চুলের মুঠি ধরে শয়তানীটাকে রাস্তায় বের করে দি। হাতের তেমন জোর থাকলে

এখান থেকে ঢিল ছুঁড়তুম। কিছু তো একটা করতে হয়। বলুন না মশাই কি করা যায়? একটা বুদ্ধি দিতে পারছেন না?

—আমেরিকা হলে ডিভোর্স করার পরামর্শ দিতুম। অ্যাডাল-টারির চার্জ এনে ঠুকে দাও মামলা।

—সাক্ষী দেবেন?

—আমি নির্বিবাদী মানুষ। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

—সে কি, আপনার কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই! চোখের সামনে অনাচার। একটা মেয়েছেলে সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলবে না? আগেকার দিন হলে গ্রামের মোড়ল মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দিত। কাজির আমল হলে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে ডালকুকুর দিয়ে খাওয়াত।

—আপনি স্বাবলম্বী মহিলা, আপনার অত ভয় কিসের? কেন পড়ে পড়ে মার খাবেন?

—বাঃ খুব বললেন যা হোক। আমি ডিভোর্স করলে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?

—আমি? শশাঙ্ক হাসলেন, আমার বিয়ের বয়েস আছে আর?

—বিলেতে বুড়োবুড়ির বিয়ে হয় না?

—তা হয়, তবে এটা তো বিলেত নয়।

—তা হলে ডিভোর্সও হয় না, হয় ঝ্যাঁটা-পেটা। ঝেঁটিয়ে আমি আপদ বিদেয় করব। এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

শশাঙ্ক জল এনে দিলেন। ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে খেলেন।

—প্রেসারটা আবার বেড়েছে। আজ আপনি আমার যা করলেন, জীবনে ভুলব না। আপনারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। মিলেছে ভাল। মেয়েরাও একটু আদর চায়, যত্ন চায়। শুধুই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে আর বাচ্চা বিয়োবে তা হয় না। এই নিন কিছু ওষুধ রাখুন, এইটা অম্বলের, এটা মাথাধরার, এটা আমাশার। আরও আরও এনে দোব। যাই, নরকে ফিরে যাই। সতীন নিয়ে সোনার সংসার। এই বাড়িটা কি শান্তির। সেই চটের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোলেন। যাবার ইচ্ছে নেই তবু তো যেতেই হবে।

কিছু কেনাকাটার ছিল। বিস্কুট ফুরিয়েছে, টুথপেস্ট গেল গেল হয়েছে, সাবানের ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দাড়ি কামাবার ব্লেড। চিঠি লেখার প্যাড! স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছেন। মালপত্তর ওজন হচ্ছে। নজর চলে গেল একটা প্যাকেটের ওপর, হেয়ার ডাই, ব্ল্যাক। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এক শিশি কিনে দেখলে হয়। সুধা মাঝে মাঝে বলত, কি বুড়োটে হয়ে যাচ্ছ, চুলে একটু কলপ লাগাও না। চুল কালো করে দেখতে ইচ্ছে হয়, দাদু থেকে দাদা হওয়া যায় কিনা?

পাগল। পাগল। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

একশো গ্রাম লজেনসও কিনলেন। একটা মুখে ফেলে পার্কে বার কতক পাক-মেরে বাড়িমুখো হলেন। পার্কে আজকাল বুড়োদের বেড়ানো চলে না। ছেলেমেয়েরা বড়ো সাহসী হয়ে উঠেছে। তাকালে আবার সিটি মারে। বইয়ে পড়েছেন লন্ডনের হাইড পার্কে সকালবেলা ঝুড়ি ঝুড়ি সেই সব পড়ে থাকে। নাঃ, পৃথিবীটা চিরকালই যুবক যুবতীদের। তারা যা করবে সেটাকেই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। ওই যে রাধাচূড়া গাছের তলায় যে জোড়াটি বসে আছে তাদের যদি বলেন, অ্যায় কি হচ্ছে, সব কটা জোড়া তেড়ে এসে আপনার জিওগ্রাফি পাল্‌টে দেবে।

বাড়ি ফিরে এসে কাপড়ের আলমারিটা খুললেন। সবে সন্ধে নেমেছে। দিনশেষের তরল অন্ধকারে জনপদের বাতি সারি সারি ভাসছে। এখনও কিছু কিছু বাড়িতে শাঁক বাজে। শশাঙ্ক তাঁর স্ত্রীর একটি শাড়ি বের করলেন। ডুরে শাড়ি। রঙটি বেশ গাঢ়। শাড়িটাকে পাশ বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। সুধা যেন শুয়ে আছে। একটা সায়া বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। অর্গান্ডির একটা ব্লাউজ হাতে ধরে স্পর্শ নিলেন। পুরনো জিনিসগুলোকে জোড়াতালি লাগিয়ে হারানো অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার চেষ্টা। যে শরীরের এই সব আচ্ছাদন

সেই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে। কালে এগুলো কীটদষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে। তাঁকেও যেতে হবে।

বিছানার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন,

—সুধা, ওঠো, সন্ধেবেলা শুয়ে থাকতে নেই, ওঠো, উঠে বসো।

নিজের পাগলামিতে নিজেই হেসে উঠলেন। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সব পাট করে তুলে রাখলেন। ইডিয়েট, ইডিয়েট। একটা টিনের কৌটের মধ্যে কাঁচা সিদ্ধির পাতা ছিল। দু চিমটে মুখে ফেলে চিবোলেন। তেতো, তেতো। আজ একটু নেশা চাই নেশা! স্বপ্ন চাই। সেই স্বপ্ন। সুধার হাত ধরে নৌকো থেকে পাড়ে নামাচ্ছেন। সাবধানে, দেখো পড় না যেন।

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি।

মাঝে-মধ্যে সুধাকে চিঠি লেখেন শশাঙ্ক। পৃথিবীর কোন পোস্টম্যান সে চিঠি বিলি করতে পারবে না। লিখে তাই ছিঁড়ে ফেলেন। ছোট ছোট সাংসারিক কথা। মান-অভিমান।

সুধা, বহুদিন হয়ে গেল, জানি না তুমি আগের ঠিকানাতেই আছ, না অন্য কারুর মেয়ে হয়ে নেমে এসেছ। ভেবেছিলুম অন্তত একদিনও তুমি আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়াবে। রাত তখন গভীর নিস্তব্ধ, আমার জ্বর হল, মানু এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, তুমি কিন্তু এলে না। ওখানে তুমি হয়ত আমার চেয়ে প্রিয় কোন সঙ্গী পেয়ে গেছ। যে-সব দায়িত্ব তুমি দিয়ে গেছ সবই আমি একে একে গুছিয়ে এনেছি, কেবল সুধীরের বিয়েটাই বাকি। ওই কাজটা শেষ হলেই, কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বাড়ি। তীরে আমার নৌকো বাঁধা। জোয়ার এলেই ভেসে যাব। আর কটা দিন। রাত প্রায় কাটিয়েই এনেছি, আর প্রহরখানেক মাত্র বাকি, একটুর জন্যে তাল আর ছাড়ছি না। বড়ো ক্লান্ত তবু মুজরো শেষ করেই যাব। ততদিন তুমি কি আমার অপেক্ষায় থাকবে? আর এক সুধা এসে কদিন খুব হামলা করছে। তোমার বিছানা দখলের তালে আছে কিনা কে জানে! মন না মতিভ্রম।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

কে এল ? সুধী। আজ বেশ একটু সকাল। কোনদিন কখন আসে।

—যাক আজ বেশ সকাল সকাল এসেছিস।

—হুঁ।

—শরীর ভাল তো ?

—হুঁ!

শশাঙ্ক একটু ঘাবড়ে গেলেন। সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত জবাব। সুধীরের তো এমন কাটাকাটা স্বভাব নয়!

—কি খাবি এখন ? একটু চা বসাই ?

—কোনও প্রয়োজন নেই।

ছেলেটা আজ মনের ওপর বড়ো ধাক্কা মারছে তো! কি হল! অসহায়, বুড়ো মানুষ। বড়ো ভয় করছে।

—আজ তোর কি হয়েছে সুধী ?

—কিছুই না।

—কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে এমন কাটাকাটা উত্তর কেন ?

পোর্টফোলিও ব্যাগটা বিছানার ওপর ঝপাং করে ফেলে দিয়ে সুধী রিস্টওয়াচ খুলতে খুলতে বলল,—তুমি আমাদের ফ্যামিলির মুখে চুনকালি মাখিয়েছ।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখের ওপর চশমা। চশমার কাঁচে আলোর ছটা। চোখ দেখা যাচ্ছে না।

—আমি ?

হ্যাঁ, তুমি। তুমি এই বয়সে বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে সারাদিন যা তা কর।

—সে কি ? কে বললে ?

—যাদের মধ্যে বাস করছ তারাই বললে। সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা যায় না বাবা।

—ভুল শুনেছিস। এ সব-অপপ্রচার।

—তুমি অস্বীকার করতে পার, এ বাড়িতে কোন মহিলা আসে না ?

—হ্যাঁ আসে, কিন্তু কেন আসে তুই জানিস ? আসল রহস্য জানিস ?

—আমি জানতে চাই না। শুধু এইটুকু জানি, আমার দুর্ভাগ্য তোমার ছেলে হিসেবে আমাকে পরিচয় দিতে হয়।

—এত বড়ো কথা।

—হ্যাঁ এত বড়ো কথা। বৃদ্ধ বয়সে পদস্খলন। তোমার ওপর আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাও আর নেই।

—তুই আমার কাছে ঘটনাটা শুনবি না ?

—না, যা শোনার আমি প্রতিবেশীর কাছ থেকেই শুনেছি। চরিত্রহীন এক মহিলা, প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দু নম্বর একজনের সঙ্গে ঘর বেঁধে তিন নম্বরের কাছে নাচতে আসেন। ছি ছি !

চার

সকালে শশাঙ্ককে কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত মনে হল। শুকনো মুখ। রাতজাগা লাল চোখ। বিছানা সারারাত শূন্য পড়ে রইল, বসার ঘরেই রাত কাটালেন। সুধীর সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। দুজনেই দুজনের কাছে ঘৃণিত। সুধী শোবার আগে ভেবেছিল বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিছানায় এনে শোয়াবে। রোজ যেমন গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইভাবেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের মনকে রাজি করাতে পারল না কিছুতেই। ফেরার পথে রাজেনবাবু তাকে যা তা বললেন।

—তোমার বাবার আবার বিয়ে দাও হে। তোমার বিয়ে না হয় পরেই হবে।

কথাটা শূলের মত মনে বিঁধে আছে। চরিত্রহীন পিতার পুত্র —এই পরিচয়ে সে পরিচিত হতে চায় না। সে নিজেকে বোঝালো, বেশ করেছি বলেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত। হলেনই বা বাবা। যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, নিজের স্বভাবের জন্যেই পেলেন। যেখানে খুশি যেভাবে খুশি রাত কাটান।

বাড়িতে মেয়েছেলে এনে ফূর্তির সময় তোমার মনে ছিল না বিপত্নীক বৃদ্ধ। সমাজের হাজারটা চোখ।

দুপুরের দিকে নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক উন্মাদের মত বার কতক হাসলেন।

—তোমার সংসার আজ ভেঙে গেল সুধা। চারদিকে সাজানো সব তাসের ঘর। জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কিছু কর তৃতি। জাগত দীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি। স্বপ্নের ভোগৈশর্য স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল। আমি এখন সজাগ, মায়ামুক্ত। সুখের স্বপ্ন আমার কাছে ঘোর বিষাদ। তোমার স্মৃতি রইল, তোমার ছেলে রইল। আলমারি-ভর্তি তোমার জামা-কাপড়, গয়না রইল। তোমার ছেলের বউ এসে পরবে। তোমারও দেখা হল না, আমারও দেখা হল না। রাত যায়, স্বপ্ন যায়, আবার রাত আসে, নতুন স্বপ্নও আসে। আমি শুধু আমাদের বিয়ের আংটিটা তোমার কাছে চেয়ে নিলাম। সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে। জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি। তুমি যেন ঘৃণা কোরো না।

সাদা টেনিস সার্ট পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে কিটব্যাগ। একমাথা উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল। চোখে পুরু কাচের চশমা। শশাঙ্ক সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। শেষবারের মত তালাবন্ধ দরজার দিকে তাকালেন। মায়া কাছা ধরে টানছে। না, আর না। জয় শিবশম্ভু, উখার দে মকান লাগা দে তম্বু।

নিচের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কাছে চাবি রাখলেন। বলা যায় না—এই চাবিই হয়ত আঁচলে বেঁধে তুমি একদিন ওপরে উঠবে। মা! আমার এই কলমটা তোমার খুব ভালো লাগত।

—এই কলমটা তোমাকে দিয়ে গেলুম। তুমি বলেছিলে বেশ লেখে।

—আপনি কোথায় চললেন, এই দুপুরবেলা ?

—মনটা বড়ো উতলা হয়েছে মা, যাই মেয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি কয়েকদিন। তোমরা সব সাবধানে থেকো।

—কলমটা দিয়ে দিলেন ?

—আর কি হবে মা। চিঠিও লিখি না, চোখেও দেখি না।

তোমার কাছে আমার একটা স্মৃতি থাক, কে বলতে পারে, আজ আছি, কাল হয়ত থাকব না।

শশাঙ্ক রাস্তায় নেমে এলেন। মোড়ের মাথায় সেই বুড়ো রিকশাওলা। পাদানিতে বসে বসে গাছের ছায়ায় ঝিমোচ্ছে। শশাঙ্ক তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—তুমি গত শীতে আমার কাছে একটা সোয়েটার চেয়েছিলে?

—হাঁ বাবু।

—এই নাও।

—শীতের তো এখনও দেরি আছে।

—দূর বোকা। দেরি আছে তো কি হয়েছে। একদিন তো আসবেই, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না।

পাড়ার সকলেই শশাঙ্ককে চলে যেতে দেখেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো সেই সব কথা থেকে কিছুতেই পরিষ্কার হল না, তিনি কোথায় গেছেন। সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললেন, —আমাকে ওয়েলসের ডায়েরিয়া অ্যাণ্ড ডিসেন্ট্রি বইটা দিয়ে বললেন, রাখ তোমার কাজে লাগবে। এক পুরিয়া অর্শের ওষুধ খেলেন। জিজ্ঞেস করলুম, এমন সময় কোথায় চললেন কাকাবাবু? হাসতে হাসতে গান গেয়ে উঠলেন, জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই!

ফিরে আয়

অ্যালবাম থেকে পোর্ট্রেট সাইজের একটা ছবি খুলে মাধবী কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'এই ছবিটাই শেষ তোলা হয়েছিল, এই বছর-খানেক আগে। ওর এক বন্ধু তুলেছিল।' অনিল হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল। পরিষ্কার স্পষ্ট ছবি। রাগ রাগ চেহারার এক যুবক। কান চাপা, ঝাঁকড়া চুল। নাকটা খাড়া, গাল দুটো অল্প ভাঙা। কপালের ডানপাশে একটা কাটা দাগ। ছেলেবেলার দুর্ঘটনার স্মৃতি।

অনিল বললে, 'হ্যাঁ এই ছবিটাতেই হবে।'

অ্যালবামে আরও অনেক ছবি রয়েছে। বিভিন্ন বয়সের রঙেন। অন্নপ্রাশনে, জন্মদিনে. স্কুল থেকে কলেজে। কোথাও মা-বাবার সঙ্গে, কোথাও বন্ধুদের সঙ্গে। মাধবী একে একে পাতা উলটে দেখতে লাগল। সতের বছরের সঞ্চিত স্মৃতি।

মাসখানেক আগে অনিলের এক বন্ধু অনিলের একটা ছবি তুলেছিল। অনিল যখন অফিসের টেবিলে বসে কাজ করছে সেই সময়। ছবিটার ফুলসাইজ প্রিন্ট এখন অনিলের চোখের সামনে টেবিলের কাচের তলায়। অনিল রাখেনি। রেখেছে মাধবী। বাঁধাবার খরচ অনেক। তবু কাচের তলায় থাকলে ভাল থাকবে।

অ্যালবাম মুড়ে রেখে মাধবী উঠে গেল। সতের বছরের ছেলের জন্যে গত তিন দিন অনেক কেঁদেছে। আর কত কাঁদবে। সংসারে

সবই সহ্য করতে হয়। সবই সয়ে যায়। বিচ্ছেদ, সে তো টিকটিকির ন্যাজ খসে যাওয়ার মত। দেখতে দেখতে আবার গজিয়ে ওঠে। শূন্যতা ভরে যায়। একটু বেদনা, একটু স্মৃতি। চাকা ঘুরতেই থাকে। অভ্যাসের চাকা।

রঞ্জনের ছবিটা অনিলের ছবির পাশেই পড়ে আছে। একটা বড় মুখ, একটা ছোট মুখ। একটা ঝলসে গেছে, আর একটা এখনও তাজা। একটা প্রায় শেষের সীমানাচিহ্ন আর একটা শুরুর মাইল পোস্টে। পথ সেই এক। দু'টো মুখের দিকে অনিলের হঠাৎ নজর পড়ে গেল। কী আশ্চর্য সাদৃশ্য।

আজ তিন দিন হয়ে গেল, রঞ্জন নিরুদ্দেশ। অনুসন্ধানের কোনও ত্রুটি হয়নি। সর্বত্র দেখা হয়েছে। পুলিসে ডায়েরিও করা হয়েছে। কোথায় রঞ্জন। বাষ্পের মত যেন মিলিয়ে গেছে। সঙ্গে কিছু নিয়েও যায়নি। পড়ার টেবিলে স্তূপাকার বই। ড্রয়ারে কলম। শূন্য একটা মানিব্যাগ। আলনায় জামাপ্যান্ট। যেখানে যা ছিল সবই পড়ে আছে এলোমেলো ছত্রাকার। রঞ্জন উড়ছিল ঠিকই, দাঁড়ে ফিরে আসত। দানাপানি খেত। পড়ুয়া কাকাতুয়ার মত রাধেকৃষ্ণ না বললেও, আবোল-তাবোল কপচাত। সুখশ্রাব্য না হলেও সকলকে শুনতে হত। এবার পাখি শিকলি কেটে সত্যিই উড়ে গেছে।

রঞ্জন আমাদের বখে যাওয়া ছেলে। সিগারেট তো ছোট নেশা। তার চেয়েও বড় নেশার অভিজ্ঞতা রঞ্জনের হয়েছিল। অনিল জানে, সব জানে। মুখ দেখলে বোঝা যায় মানুষ কতটা পবিত্রতা হারিয়েছে। চোখ দেখলে মনের খবর জানা যায়। এই তো অনিলের মুখ, ওই তো রঞ্জনের মুখ। এই মুখই তো বলতে পারে, ওই মুখের কথা। সব ব্যাঙের গায়েই তো ধীরে ধীরে দেখা দেবে গরলে ভরা বিষাক্ত গুটিকা। ভেকের সন্তান তো ভেকই হবে। সাপের সন্তান সাপ। তবে কী অধিকার ছিল অনিলের রঞ্জনকে শাসনের।

অনিলকে কে শাসন করবে! অনিলের বিবেক। সে বিবেক বহুকাল নিদ্রিত, অনন্ত-শয়ানে পাপের সমুদ্রে ভাসছে। প্রবৃত্তির

ক্রীতদাস অনিল আর একজনের প্রবৃত্তিকে কী করে সংযত করবে? উত্তরাধিকার বলে একটা কিছু অবশ্যই আছে। সেটা কী? সে আর ভেবে লাভ নেই। যা হয় তা হয়। রক্তের ধারা নদীর মতই চলে। কাকের পালক দেখতে দেখতেই কালো হয়ে ওঠে। রঞ্জনের ছবিটা একটা খামে ভরে রেখে অনিল উঠে দাঁড়াল। জীবনে এত জট পাকিয়ে রেখেছে, সব জট কি আর খোলা যাবে? কে খুলবে?

ঘরের দেয়ালে অনিলের বাবার ছবি কাত হয়ে ঝুলে আছে। বহুকাল কেউ ধুলোটুলো ঝাড়ে না। ফুলের মালার বদলে চারপাশে ঝুলের ঝালর ঝুলছে। অনিলের মাঝে মাঝে চোখ পড়ে যায়। জীবন আর ছবি, দুটোকেই পোকায় কাটে। একটাকে দেখা যায় না, আর একটাকে দেখা যায়। কীটদষ্ট পূর্বপুরুষকে দেখে অনিলের তেমন কিছু ভাবান্তর হয় না। কে, কাকে, ক'দিন মনে রাখে। ভোগে দুর্ভোগে নিজেকে নিয়ে মানুষ বড় ব্যস্ত। আজ কিন্তু ছবির সেই বিবর্ণ মানুষটির দিকে তাকিয়ে অনিলের মন বলে উঠল, ঠিক তুমিও যেমন, আমিও তেমন। তখনও তোমার কত কুকীর্তি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। শেষ বয়সে একটু ধার্মিক হয়েছিলে। তাতে তুমি মোক্ষলাভ করেছ কি না জানি না। তবে তোমার নামের কলঙ্ক ধুয়ে যায়নি। আজও শোনা যায়, বকধার্মিক আশু কেমন একে একে সব কটা ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়সম্পত্তি সব গ্রাস করে নিলে? কেউ কেউ আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে, মোষের মত শরীর ছিল, যৌবনে স্ত্রী বিয়োগ হল, রুগ্‌ন বড় ভাইয়ের স্বাস্থ্যবান স্ত্রীটিকে বেশ মনে ধরল। তারপর কী হল? মধু ডাক্তারের ইন্টারভেনাস ইনজেকসান। তারপর কী হল? তিনি গেলেন। আপনি রইলেন। কে কাকে কতদিন মনে রাখে। কত মাছই তো বঁড়শি গেলে তবু সব মাছই তো মুখিয়ে থাকে। টোপের আশায়। মাছের তো শিক্ষা হয় না। আপনার বউদি কি ঠিক থাকতে পেরেছিলেন? দেহের মধ্যে যারা থাকে তারা কুরে কুরে খায়। সুখ আগে, না ত্যাগ আগে? যে যায় সে কি আর দেখতে আসে কে কী করছে? আসে না। মৃতের জগৎ আর জীবিতের জগৎ আলাদা। আমি জানি না, লোকে বলে, ওই যে

তোমার বাবা মাঝে মাঝেই বউদিকে নিয়ে তীর্থে যেতেন, ধর্মের টানেই যেতেন, তবে সে হল মানবধর্ম। মনে নেই, শেষ বয়েসে তোমার জ্যাঠাইমার কী রকম ছুঁচিবাই হয়েছিল। তোমার বাবার বুলডগের মত মুখ একজিমায় কালো হয়ে গিয়েছিল। মানুষ কীসের সঙ্গে কী যে সব জুড়ে দেয়। কিন্তু!

অনিল ভয়ে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। যখনই সে এসব ভাবে তখনই ধাক্কা খায় এই 'কিন্তু'তে এসে। পাপ করলে একজিমা বা কুষ্ঠ হয় কিনা, সেকথা শাস্ত্রে লেখা নেই। মনে পড়ে, জ্যাঠাইমার শেষ বয়সে বাবা যখন প্রায় না খেতে দিয়ে মৃত্যুকে আরও কাছিয়ে আনলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝেই চিৎকার করে বলতেন, তোমার কুষ্ঠ হোক। আর তার বাবা কিছু দূরে বসে মৃদু মৃদু হেসে বলতেন, পাগলে কী না বলে? তোমরা বুঝলে, পাগলে কী না বলে। পাগলে যাই বলুক, দগদগে একজিমার ঘায়ে সারা শরীর ঢেকে গেল। পাপ হয় তো রক্তে ঢোকে না কিন্তু কিছু অসুখ রক্ত থেকেই রক্তে ছড়ায়। একজিমা সেই রকম একটি অসুখ। তার মানে আমারও ওই এক পরিণতি। বীজের আকারে প্রবাহে ঢেলে দিয়ে গেছ। আসছে, তারা আসছে। পায়ের চেটো বেয়ে ধীরে ধীরে মুখে উঠে আসবে। তোমার কিছু না পাই ওটা পাবই। কিছুই যে পাইনি তাও তো নয়। এত বড় একটা বাড়ি পেয়েছি, তোমার রক্তে যারা কাঁদত তারা আমার রক্তেও কাঁদছে, তোমার সন্দেহ, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, লোভ ভোগের ইচ্ছে সবই তো পেয়েছি। শেষ বয়েসে তোমাকে ছুঁতে যেমন ভয় পেতুম এখন তোমার ছবিটাকেও তেমনি ছুঁতে ভয় করে। তবে আমিও আসছি। তুমি ডান দিকে হেলে আছ আমি বাঁ দিকে হেলে থাকব।

অনিল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মাথার ওপর বিরাট এক মামলার ছায়া ঘনিয়ে আসছে: কেসটার একটু তদবির করা দরকার। চাকরি তো যাবেই উলটে জেলও হয়ে যেতে পারে। এ সব কথা মাধবী জানে না। এক সময় মাধবী শয্যাসঙ্গিনী ছিল। তখন একটু প্রেম-ট্রেম হত। ভালবাসার কথা হত। সুখ-দুঃখের কথা হত। জীবন-পরামর্শ হত। এখন মাধবী অ্যাপেনডিক্সের

মত। আছে থাক। মাঝে-মধ্যে যখন সাইটিস হয়ে ওঠে তখন কেটে ফেলার চিন্তাই আসে। ফেটে বসলে পেরিটোনাইটিস হয়ে জীবন বিপন্ন করে দেবে। মাধবীকে এমন কিছু দেওয়া হয়নি যাতে বলা চলে ওহে আমি রত্নাকর, তুমি কি আমার পাপের ভাগ নেবে? যেমন রঞ্জনকে বলা সম্ভব হয়নি, আমি তোর আদর্শ পিতা। আমার ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযমের কাছে নতি স্বীকার কর। যাকে বলা যায়, সে হেসে বলবে, ভোগের মাসুল দেবে না মধুকর?

ভবেশবাবুর চেহারা বাঘা উকিলের মতই। কথা কম। ফি বেশি। যা বলার তা এজলাসেই তো বলব। মক্কেলের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়ে পরমায়ু ক্ষয় করে লাভ কী? এখনও অনেক বছর কোর্টে দাঁড়িয়ে চোরকে সাধু, সাধুকে চোর করতে হবে। অনিলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'স্টক থেকে অতগুলো টাকার মাল সরালেন, কাজটা একটু আটঘাট বেঁধে করলেন না। চুরিতে এত ফাঁক থাকলে উকিলকে পয়সা ঢাললে কী হবে? আমার কী এত ক্ষমতা যে রাতকে দিন করে দোব। আগেই বলে রাখি আপনার কেসের অবস্থা তেমন ভাল বুঝছি না।'

অনিল আমতা আমতা করে বললে, 'আজকাল মানুষ খুন করে বেঁচে যাচ্ছে, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এই সামান্য ব্যাপারে ফেঁসে যাব?'

'ওই তো হয় মশাই। ডাকাতি করে কিছু হল না, ছিঁচকে চুরি করে জেলে চলে গেল। আপনার এখন একমাত্র বাঁচার রাস্তা দপ্তরের ওই নতুন নিরীহ ছেলেটিকে জড়িয়ে দেওয়া। কী যেন নাম বলেছিলেন?'

'নীহার বোস।'

'হ্যাঁ, ওই নীহারকে বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচতে হবে। সে রাস্তা কি খোলা রেখে এসেছেন?'

'আপনি কি আমাকে অত বোকা ভাবেন? চাকরিতে চুল পাকিয়ে ফেললুম আর বলির পাঁঠা তৈরি রেখে আসব না।'

'কেসটা আমি ওইভাবেই তা হলে সাজাই। তারপর দেখা যাক,

জজে মানে কি না। ও-পক্ষের উকিলও তো কিছু কম যায় না।'

'তা ঠিক। তবে ওটা তো চুরিরই জায়গা। ও-চেয়ারে যেই বসে সেই চুরি করে। ওপরআলা মিত্তিরের সঙ্গে ভাগের গোলমাল না হলে আমার ফেঁসে যাবার কোন কারণ ছিল না।'

'ওই তো হয়, সেই চোরই ধরা পড়ে, দারোগার সঙ্গে যার অবনিবনা।'

অনিল ভবেশবাবুর হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নেমে মনে হল, কাজটা কি ঠিক হবে! নীহার ছেলেটাকে জড়িয়ে ফেলা। সবে বিয়ে করে চাকরিতে ঢুকেছে। অনিলদা অনিলদা করে। করুক! অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি তো উপলক্ষ মাত্র। জীবই তো জীবের আহার। নীহারকে ফাঁসাতে পারলে তার নিজের পোজিসান ভাল হয়ে যাবে। চোরের জায়গায় সাধু, সাধুর জায়গায় চোর। বড়কত্তারা বলবে, বাবা, অনিল হল দুঁদে লোক। ঘাতঘোত সব জানে। ওর সঙ্গে চালাকি। সঙ্গে সঙ্গে অনিলের আরও প্রমোশন। নীহারের সাসপেনসান। জেল। আর তখন?

ভবেশবাবুর বাড়ির সামনে ফুটপাথে অনিল কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় ব্যস্ত জগতের প্রবাহ বইছে হু হু করে। যত দিন যায় জীবন ততই দ্রুত হতে থাকে। আবার নীহারের চিন্তা মাথায় এল। সাসপেনসান। হাজার হাজার টাকার ডিফালকেসান কেস। বছর পাঁচেকের জেল তো হবেই। আর তখন? অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংসানে নীহারের সদ্য বিয়ে করা বউকে দেখেছি। বেশ ভাল। অভিনয়-টভিনয় করে। ভাল নাচে। হাতকাটা ব্লাউজ পরে। ভুরু কামিয়ে আবার আঁকে। ও জিনিস নীহারের একার জন্যে নয়। সকলের জন্যে। নিশ্চয়ই অ্যামবিশান আছে। প্রেম করে নীহারের মত ছেলেকে বিয়ে করে ফেলেছে। ও প্রেম চটাক যাবেই। কেরিয়ারের লোভ দেখালেই বেরিয়ে আসবে। বিলাস বাঁড়ুজ্জ্যের হাতে একবার কোনও রকমে ঘুরিয়ে ফেলে দিতে পারলে ও ঠিক লাইনে নিয়ে আসবেই। ধর্মতলার সেই জমাটি দোকানে বারকতক আসা যাওয়া। দু-চারটে

ডিরেকটর আর ক্যামেরাম্যানের হাতে লোফালুফি হতে হতে নৈবেদ্যের থালায় চলে আসবে। সারা জীবনে ওরকম মেয়ে কত দেখা হয়ে গেল। নাঃ বয়স যত বাড়ছে খিদে ততই বাড়ছে। নতুন কি আছে কে জানে। সবই তো সেই এক। তবু রক্তে যেন কিসের জীবাণু ছটফট করিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছে না। আরো লোভ, আরো ভোগ। যত রাত বাড়তে থাকে, ততই মনটা নাচতে থাকে।

অনিল হাত তুলে একটা ট্যাকসি থামাল। ড্রাইভার মনে হয় লোক চেনে। থেমে পড়ল। নীহারের বউয়ের কথা ভাবতে মুখে একটা লম্পট লম্পট ভাব এসেছে। এরা লম্পটদের বেশ খাতির করে। তা না হলে মাতালরা বাড়ি ফেরে কি করে! অনিল বহুদিন লাল আলোর এলাকা থেকে সহজেই ট্যাকসি ধরে মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছে। কখনো কোনো অসুবিধে হয়নি।

বউবাজার স্ট্রীটে একটা গয়নার দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে অনিল একটা লকেট কিনে ফেলল। এতকাল লোকে তাকে তদবির করেছে। ঘুস-ঘাস দিয়েছে। হোটেলে ঘর বুক করে ফুর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জীবনে ঝাড়বাতি জেবলে দিয়েছে। আজ তাকে তদবির করতে হবে। চাকা তো এই ভাবেই ঘুরে যায়। আবার যেদিন মওকা মিলবে সেদিন দেখে নেওয়া যাবে। লকেটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে অনিলের মনে হল, সেই বর্ষার রাতে, নাটু ঘোষের সঙ্গে রোশান বাঈয়ের ঘরে বসে বসে মাইফেল শুনছে ঃ দেখকুর রঙ্গ-এ-চমন হো ন পরেশাঁমালী। কৌকবে গুঁচ ঃ সে শাঁখে হেঁ চমকতে বালী।

নরেন হালদার-এর বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকে না। অনিল বড় রাস্তাতে গাড়ি ছেড়ে দিল। দু'পাশে নোনা ধরা দেওয়াল উঠে গেছে। মাঝখানে পড়ে আছে সরু গলি। দু'হাত অন্তর আঁস্তাকুড়। ভ্যাপসা গন্ধ। রাস্তায় আলো নেই। মাঝে মাঝে খোলা জানলা গলে একটু আধটু আলোর রেখা এসে পড়েছে। ড্যাম্প ঘরে সংসারের খেলা কিছু কম জমেনি। খোলা জানলা দেখলেই অনিলের চোখ চলে যায়। অনেক দিনের অভ্যাস। খাটে

উপুর হয়ে শুয়ে, ডুরে শাড়ি পরে সদ্য বিবাহিতা বই পড়ছে। পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে ওপর দিকে উঠে রেলের সিগন্যালের মত হয়ে আছে। কোনও জানলায় চুল বাঁধার দৃশ্য। রাত ঘন হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই হাঁসফাঁস শহর ঘুমোতে যাবে। নরেন হালদার আচ্ছা জায়গায় থাকে।

নরেন হালদারের বাড়িতে বাচ্চাদের কান্নার মাইফেল বসেছে। অন্ধকার ঘুপচি নিচের তলায় খানতিনেক ঘরে নরেন চোখ-কান বুজিয়ে তার বংশ বিস্তার করে চলেছে। মাঝখানে শ্যাওলা-ধরা উঠোন। চারপাশে তলার ওপর তলা খাড়া মাথা তুলেছে। ভেতরে দোতলা তিনতলার বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ি নিথর ঝুলছে। বাতাস ঢুকতে ভয় পায় এ বাড়িতে। নিচে জানলায়-জানলায় এক সময় তারের জাল পড়েছিল। ধুলোয়, ধোঁয়ায়, ঝুলে এমন চেহারা হয়েছে! সংসারটাকেই অস্পষ্ট করে তুলেছে।

অনিল ঢুকেই দেখল নরেনের বউ একটা বাচ্চাকে বেধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছে। আর একটা মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে টানছে। অনিলের হাসি পেল, এর জন্য সোনার লকেট! এক নজরে মেয়েদের শরীর দেখে নেবার অভ্যাস অনিলের আজকের নয়, অনেক দিনের। গুরুর ধরে শিক্ষা। মহিলার ছিল সব। নরেনের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিকমত ব্যবহার হয়নি, তদবির হয়নি, সার্ভিসিং হয়নি। করপোরেশানের লরির মত ইঞ্জিন শব্দ ছাড়ছে। এগজস্টে ডিজেলের ময়লা জমেছে। মুখটা ধারালো। অনিলের হাতে থাকলে বীয়ার খাইয়ে মাসখানেকেই মাংস ধরিয়ে দিত। রঙ খুবই ফর্সা। একটু রক্ত ঢোকাতে পারলে গোলাপী আভা ছাড়ত। এক সময় যথেষ্ট চুল ছিল। শ্যাম্পু করে এলো খোঁপা বেঁধে দিলে মন্দ হবে না। দু একটা ভাল শাড়ি আর ব্লাউজ। তারপর পাশে এসে বোসো। বুকের ওপর লকেটটা কেমন মানায় দেখি।

অনিল পেছন দিক থেকে মহিলাকে দেখছিল। শাড়িতে আটার গুঁড়ো লেগে আছে। জল-হাত মুছেছিল। এখনও খামচা হয়ে আছে। মায়া লাগছিল। সম্ভাবনাময় মেয়েরা অন্যের হাতে থাকলে বড়ো কষ্ট হয়। মানে, কি হতে পারত, কি হয়ে আছে।

পরে অবশ্য মায়াটায়া আর তেমন থাকে না। তা হলেও পার্কের গাছের মত প্রথমটায় যত্ন করে ছেড়ে দাও, তারপর সে তো আপনিই ফুলে-ফলে শোভা হয়ে থাকবে। পাড়ো, খাও। ছায়ায় গিয়ে বস। ভাল জিনিসের কদর বুঝতে হয়। মাধবী যখন এসেছিল, কি ছিল? এখন কি রকম হয়েছে? তবে একটু বেশি হয়ে গেছে। সবই বেশি বেশি। এখন আর মানুষের নোলায় জল পড়বে না। বাঘ জিভ ঢোকাবে।

অনিল গলা উঁচু করে বললে, 'নরেন কোথায়?'

মহিলা চমকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে মাথায় আঁচল টেনে বলল, 'ডেকে দিচ্ছি।'

ডেকে দিতে হবে। ডাকলে শুনতে পাবে না। বাচ্চাটা যা চেল্লাচ্ছে। সত্যি কথাই। শব্দ ব্রহ্ম। নরেন কোণের দিকের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু'-হাতে আটা। রুটির আটা মাখছিল। বউকে সাহায্য করছিল।

'আরে দাদা আপনি! কি মনে করে?'

অনিল মধুর হেসে বললে, 'তোমাকে মনে করে। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।'

'না, না, ব্যস্ত না। এই রুবিকে একটু সাহায্য করছিলুম। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দাঁড়ান হাতটা পরিষ্কার করে আসি।'

নরেন অদ্ভুত কায়দায় শ্যাওলা ধরা উঠোন পেরিয়ে অন্ধকার কলঘরের দিকে চলে গেল। আর তখনই অনিল বুঝতে পারল রুবির আবার ছেলেপুলে হবে। ভাল, এই তো বয়েস। ধর্ম, সংযম, বৈরাগ্য সবই অর্থহীন। চারপেয়ে জীবের মত সুখী হতে পারলে জীবনের চেহারাই পালটে যায়। যোগ আর ভোগ নিয়ে আজকের লাঠালাঠি। অনন্তকাল ধরে দুটো মনের তুমুল লড়াই চলেছে।

নরেন অনিলকে শোবার ঘরেই নিয়ে বসাল। তাছাড়া আর বসাবে কোথায়। ঘরজোড়া খাট। বেডকভারটা বেশ চটকদার, একপাশে আলনা। মেয়েলি জিনিসপত্র ঝুলছে। দেহের গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘরে দেবদেবীর ছবি ঝুললেও খুব একটা পবিত্র স্থান বলে মনে হচ্ছে না। দেওয়ালের দিকে খাটের বাজুতে রুবির

অন্তর্বাস শুকোচ্ছে পাখার হাওয়ায়। রান্নাঘর থেকে পেঁয়াজ ভাজার গন্ধ আসছে। রাস্তার দিকের নর্দমা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সময় নষ্ট করা অনিলের স্বভাব নয়। স্বার্থের কথা তাড়াতাড়ি বলে ফেলাই ভাল।

'নরেন, তুমি তো জানো, আমি সাসপেন্ড হয়ে আছি। যাই করুক কোর্টে আমাকে ফাঁসাতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর তাহলে আমি আরও কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। এই নাও। এটা তোমার স্ত্রীকে দিও।'

অনিল ভেলভেটের বাক্সটা নরেনের হাতে দিল। নরেন খুলে দেখল, নীল ভেলভেটের ওপর সোনার লকেট সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। নরেন মনে মনে চমকে উঠল। জীবনের প্রথম ঘুস। টাকার অঙ্কে নেহাত কম হবে না। সৎ পথে নিজের উপার্জনের পয়সায় রুবিকে এমন একটা উপহার কিনে দেবার ক্ষমতা তার নেই। আলো নেবানো ঘরে অন্ধকার বিছানায় দু'-চারটে প্রেমের কথা ছাড়া আর কিছু দেবার মুরোদ নেই। দুটি সন্তান দিয়েছে, আর একটি আনছে।

অনিল বললে, 'খুব সুন্দর মানাবে। তোমার বিয়ের সময় আমার সঙ্গে তো তোমার পরিচয় ছিল না। তোমরা দু'জনে সুখী হও। হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম। সমস্ত খাতাপত্তর এখন তোমার হাতে। স্টক, ইস্যু রেজিস্টার, কোটেসান, চালান, পারচেজ ভাউচার। তুমি সামান্য এদিক ওদিক করে দিলেই স্টোরকিপার নীহার জড়িয়ে পড়বে। নীহারের বয়েস কম, চাকরি গেলে আবার পাবে। জেলে গেলে তেমন কষ্ট হবে না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি নরেন। চুলে কলপ দিয়ে আর কতকাল বয়েস চেপে রাখব। চুরি সবাই করে। আমি তো কারুর বাড়িতে সিঁধ কাটতে যাইনি। যার অঢেল আছে, সেই সরকারের ভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু সরিয়েছি, এতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! ওই ব্যাটা ডিসপেপটিক ডিরেক্টার প্রোমোশানের ফিকিরে আমার পেছনে লেগেছে। ব্যাটা দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র! নাও, তোমার স্ত্রীকে একবার ডাকো, রাত হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বিশ্রামের সময়।'

নরেন গম্ভীর মুখে লকেট কেসটা অনিলের টেবিলের পাশে রেখে দিল।

'অনিলদা, আমার স্ত্রী তেমন মডার্ন নয়। বাইরের লোকের সামনে বেরোতে ভয় পায়। তাছাড়া, যে কারণে এটা আপনি দিতে চাইছেন, তার কিছুই করা যাবে না। সমস্ত খাতাপত্তর সিল করে গভর্নমেন্ট প্লিডারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, উপায় থাকলেও আমি আপনার মত একজন নোংরা লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করতুম না। আমার তেমন আত্মবিশ্বাস নেই অনিলদা। নেহাতই ছা-পোষা মানুষ।'

অনিল গালাগাল তেমন গায়ে মাখল না। ওসব অনেক শুনে শুনে চামড়া পুরু হয়ে গেছে। শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'সব রেকর্ডই এখন তা হলে হাত-ছাড়া ?'

'হ্যাঁ হাত-ছাড়া, আমাদের আর কিছুই করার নেই। যা হবার তা কোর্টেই হবে। ওখানেই আপনাকে লড়তে হবে।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। তুমি এইরকমই সৎ থাকো সারা জীবন। চরিত্রই সব চেয়ে বড় জিনিস, সোনার চেয়েও দামী।'

বাক্সটা তুলে নিয়ে অনিল আবার গলিতে নামল। সেই অন্ধকার, আবর্জনাময় পথ। এবার অবশ্য আরও অন্ধকারের দিকে প্রসারিত নয়। চলে গেছে আলোকিত বড় রাস্তার দিকে। নাঃ, জীবনের চালে এবার হারের সময় এসেছে। সব খেলাতেই কি আর জেতা যায় ! এতক্ষণে রঞ্জনের কথা বড়ো মনে হচ্ছে। শরীর ভেঙে আসছে। প্রস্টেট গোলমাল দেখা দিচ্ছে। হয়তো ক্যানসার ! মামা তো প্রস্টেট ক্যানসারেই গত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের কিছু পরেই। চাকরিটা তো যাবেই বোঝা যাচ্ছে। জেলের হাত থেকে বাঁচতে হলে সর্বস্বান্ত হতে হবে। একমাত্র ভরসা রঞ্জন। ছেলে যদি শেষের সময় বাপকে না দেখে, কে দেখবে ? কোথায় গেল ছেলেটা ?

শালা নরেন, কোন দিন যদি সুযোগ আসে, তোমার বারোটা আমি বাজাবই। যে হারে বংশ বিস্তার করছ, ছানাপোনা নিয়ে একদিন তোমাকে ন্যাজে-গোবরে হতেই হবে। তখন মারব তোমাকে কোপ। হাঁড়ি শিকেয় তুলে ছেড়ে দোব ! লুচি দিয়ে ডিমের কারি

খেয়ে, বউ জড়িয়ে শুয়ে পড়া বেরিয়ে যাবে! তখন আর নারী-শরীর জরিপ করতে হবে না। জরিপ করবে অভাব। সে সুযোগ কি আসবে অনিল? কত লোককেই তো দেখে নেবার ইচ্ছে ছিল? পারছি কই! প্রতিহিংসার শেষ নেই, শক্তি বড়ো কম। নাঃ, রঞ্জনটার কি হল? একটিমাত্র ছেলে!

রঞ্জনের একটা ঘাঁটি ছিল। স্যাঙাত ছিল অনেক। তারা বলেছিল, আপনি খোঁজ করুন, আমরাও দেখছি। আজকাল খুব মার্ডার হচ্ছে। কেউ ঝেড়ে দিলে কি না, কে জানে? ঝেড়ে দিলে তো হয়েই গেল। আর সে বয়েসও নেই, শক্তিও নেই, যে নতুন করে সন্তান লাভ করে আবার নব ধারাপাত থেকেও শুরু করবে। এখন যা পারা যায়, একটা ট্যাক্সি ধরে মায়ার কাছে যাওয়া। রাত বেশ হালকা ফুরফুরে, মনে বেশ অন্ধকার, মায়া বেশ পুরনো মদের মত সোনালি বুজবুজে। পাপের শরীর আর সাপের শরীর একই রকম। দেখলে গা শিউরে ওঠে, ছোবলে বেশ নেশার মৌতাত আসে। গ্যাঁড়া মিত্তির বেশ ভালই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। গ্যাঁড়া নিজে সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিসে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। তা থাক। আমি তো এখনও খাড়া আছি। মায়া অনেক ঝেড়েছে। না হয় আর একটা লকেট ঝাড়বে। ক্ষতি কি? কত জাহাজই তো সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

থাক, মায়া এখন মায়াতেই থাক। রঞ্জনের সন্ধের ঘাঁটিতে একবার যাওয়া যাক। নেতার নাম বুল। কিসের নেতা কে জানে? ওয়াগান ভাঙার, কি চোরা চালানের, কি চোলাই মদের, বুলই জানে। তবে পাড়ায় বেশ দাপট আছে। 'এই শোন' বলে ডাকলে সকলেই থমকে দাঁড়ায়। মাঝে মধ্যে জিপে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। সাবেক কালের বাড়ির নিচের ড্রইংরুমে রোজই চক্র বসে। লোকজনের আসা-যাওয়া। দেয়ালে কাত হয়ে থাকা সাইকেল। দু-চারটে মোটর বাইক, স্কুটার। গভীর রাত পর্যন্ত কিসের যে ষড়যন্ত্র চলে! মাঝে মাঝে ফোন বেজে ওঠে। রঞ্জন এই আড্ডায় কী করে এসে পড়েছিল, কেনই বা এসেছিল?

বুলের চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সারা দিনই চড়িয়ে থাকে।

ছেলেটাকে দেখতে ভারী সুন্দর। অপঘাতেই মরবে। কোনো সন্দেহ নেই। এসব ছেলে বেশিদিন বাঁচে না। অনিলকে দেখে বুল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখে সিগারেট। অনামিকায় হীরের আংটি চকচক করছে। ফর্সা কপালে এলোমেলো ঘন কালো চুল। অনিল জিজ্ঞেস করলে, 'কোনো সন্ধান পেলে ?'

'হ্যাঁ, একটা উড়ো খবর পেয়েছি। রেন্টুর বউয়ের সঙ্গে দীঘা যাবার কথা ছিল। হয়ত তাই গেছে।'

'রেন্টুটা কে ? নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না তো !'

'রেন্টু ছিল রেসের বুকি। দীঘায় একটা হোটেল করেছিল, বছর চারেক আগে দীঘাতেই জলে ডুবে মারা যায়। লোকে বলে মার্ডার। ওর বউই নাকি খুনটা করায়, মহিলার অনেক উপ ছিল। এখনও আছে। ওপরতলার জিনিস। কেস-ফেস দাঁড়ায়নি। সেই মালের খপ্পরে আপনার ছেলে পড়েছে। আমরা বারণ করেছিলুম। শোনেনি। চুষে শেষ করে ছিবড়ে ফেলে দেবে। একবার খবর নিয়ে দেখতে পারেন।'

'কোথায় নিতে হবে ?'

'ডিকসন লেনে চলে যান। মঞ্জুলা চ্যাটার্জিকে সবাই চেনে। একটা নীল রঙের ওপেল গাড়ি আছে। নিজেই চালায়। বিলিতি স্টাইলের বাড়ি। বাগান আছে। কুকুর আছে।'

ঘরে ফোন বেজে উঠল। বুল চলে গেল। সামনের বাড়িতে রেকর্ডে ঠুংরি বেজে উঠল। শরৎকাল। আকাশে মানচিত্রের মত সাদা মেঘ উঠেছে। কোন বাড়িতে রেডিও খুলেছে। কাঁপা কাঁপা গলা শোনা যাচ্ছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় বত্রিশ জনের জীবনাবসান। ধবধবে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে রোগা চিমসে মত একটা লোক কুকুর নিয়ে ফুটপাথে বেড়াতে বেরিয়েছেন। চোখে রিমলেস চশমা। কুকুরটার পেটে ক্রশ বেল্ট, প্রভুর হাতে লিড। ভদ্রলোকের মুখে সিগারেট। সামনে টাক পড়ে এসেছে। রাতের আহার শেষ করে সারমেয় নিয়ে হজমে বেরিয়েছেন। কুকুরটা একটা ল্যাম্পপোস্টে ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ করে, ফোঁস ফোঁস করে শুঁকে, খুড়খুড় করে উত্তর দিকে চলল। অনিলও চলল পেছন পেছন।

রাত হয়েছে। বাড়ি ফিরতে হবে। খবর হচ্ছে রেডিওয়। মাঝে রেকর্ডের রাগপ্রধান মিশে যাচ্ছে, কোয়েলিয়া গান থামা এবার। রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তোর ওই কুহু তান, ভাল লাগে না আর।

অনিল রিকশা চেপে, শরতের হাওয়া খেতে খেতে, মেঘ-ভাসা আকাশের তলা দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। অন্য দিন এলিয়ে পড়ে। আজ খাড়া আছে। শহর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রিকশার পা তেমন চলছে না। পাশ দিয়ে শেষ বাস চলেছে ধুঁকতে ধুঁকতে। সাদা একটা মোটর গাড়ি পেছনে লাল চোখ মেলে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলেছে। দু পাশের ফুটপাতে খাটিয়া পড়েছে। সারি সারি চাদর ঢাকা মানুষ লাশের মত পড়ে আছে। একটা মরদের কোমরের ওপর একজন জোয়ান ছুকরি দাঁড়িয়ে উঠে খুব দাবাচ্ছে। পায়ের মল বাজছে ছিনিক ছিনিক শব্দে।

বাড়ির সামনে রিকশার ঠুনুর ঠুনুর শব্দ শুনে মাধবী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। অন্য দিন অনিলকে দরজার সামনে থেকেই ধরে নিয়ে চৌকাঠ পার করাতে হয়। আজ তার আর প্রয়োজন হল না। কত বছর পরে অনিল সোজা হয়ে, শক্ত পায়ে বাড়ি ফিরল। অনিল বুঝতে পারল, মাধবী অবাক হয়েছে। দরজা বন্ধ করতে করতে মাধবী জিজ্ঞেস করল,

'কোনও খবর পেলে?'

'না তেমন কিছু নয়, তবে দীঘায় যাবার সম্ভাবনা আছে। কাল আবার দেখব। আমার কিছু খাবার আছে?' অন্যদিন অনিল খাবার মত অবস্থায় থাকে না। আজ খুব খিদে। মাধবী বললে, 'হাত মুখ ধোও, দিচ্ছি।' ঢাকা বারান্দায় মৃদু আলো জ্বলছে। উপরি টাকায় অনিল বাড়িতে অনেক রকম কায়দা করেছে, আলোর আবরণ দুধের মত সাদা। চারপাশ মায়াবী। দেয়ালে বিদেশী পেন্টিং, গিল্টির কাজ করা ফ্রেমে। বাঁ পাশে জাফরির কাজ।

মাধবী আগে আগে চলেছে। পেছনে অনিল। পায়ের কাছে শান্তিপুরী ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে। গ্রিসিয়ান নিউকাটের হালকা

মুচ মুচ শব্দ দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। কোথা থেকে শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে। বেশ লাগছে মাধবীর পেছন পেছন যেতে। এতদিন তো অনেকের পেছনেই ঘুরেছে। নিজের স্ত্রীকে তো তেমন খারাপ লাগছে না। মায়ার সঙ্গে এর তফাত কোথায়! কেমন পবিত্র শরীর। ঘটের মত নিতম্ব। পুরুষ্টু বাহু। চওড়া পিঠ।

অনিল বললে, 'দাঁড়াও।'

মাধবী অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আদেশ, অনুরোধ, স্নেহ, অত্যাচার কোনটা। শেষেরটাই তো এতকাল জুটে এসেছে। মাধবী দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিল আরও দু'পা এগিয়ে এসেছে। দু'হাতে ধরে আছে সেই লকেটটা। এর চেয়ে অবাক কাণ্ড আর কি হতে পারে? গলায় পরিয়ে দিতে দিতে অনিল বললে, 'তোমার আমি, আর আমার তুমি ছাড়া সংসারে কে আছে?'

মাধবী গলায় হাত দিয়ে জিনিসটার স্পর্শ নিতে নিতে বললে, 'হঠাৎ এই দুঃখের দিনে?'

'জীবনটাই তো হঠাৎ গো। এই আছে তো এই নেই। হঠাৎই তো সব পালটে যায়।'

'ছেলেটা কোথায় চলে গেল?'

'আসার হলে আসবে, যাবার হলে যাবে। আমিও তো রোজ এসেছি। আজকের মত কোনদিন এসেছি কি?'

অনেক দিন পরে অনিল মাধবীর পায়ে পা জড়িয়ে বুকের ওপর আদরের হাত ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কারুরই কিন্তু ঘুম এল না। আকাশে আজ অনেক তারা। বাতাস বড়ো এলোমেলো। প্রকৃতিতে যেন কিসের মাতন লেগেছে আজ। এমনও তো হতে পারে, বুল যা বললে, রঞ্জনকে হয় তো খুন করে কচুরিপানা ভরা কোনো এঁদো পুকুরে ফেলে দিয়েছে। আলকাতরার মত কালো জলে রঞ্জন তলিয়ে আছে। কেউ জানে না। শকুনরাই শুধু অপেক্ষায় বসে আছে।

পরের দিন দুপুরে অনিল বেরোল ডিকসন লেনের মঞ্জুলার সন্ধানে। মঞ্জুলা প্রকৃতই খুব পরিচিতা মহিলা। সকলেই তাকে

চেনে। নাম শুনে এক ধরনের মুচকি হাসি খেলে যায় মুখে। বুল যেমন বলেছিল বাড়িটা ঠিক সেই রকমই। তবে বড়ো বেশি নির্জন। চারপাশে বাগান। আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মত বিশাল একটা গেট। অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। ঢুকেই ডান পাশে কোনো কালে বোধ হয় একটা কারখানা ছিল, টিনের ঘরে। মরচে ধরা কিছু খালি ড্রাম পড়ে আছে। যেন নেশাখোরদের আড্ডা। কোনোটা খাড়া কোনোটা গড়াগড়ি।

কোনও একটা ঝোপে বসে দুটো হাঁড়িচাচা পাখি থেমে থেমে ডাকছে। দুপুরের ইস্পাত চাদরে যেন হাতুড়ি পিটছে। গাড়ি বারান্দার একপাশে ঝকঝকে গাড়ি পার্ক করা। রেন্টু চট্টোপাধ্যায় কত বড়লোক ছিলেন রে বাবা! কে জানে ঐশ্বর্যের গোপন কথা। কেউ কি প্রকাশ করতে চায়। বর্মাকাঠের ঝকঝকে বিশাল দরজা। সোনার মত পেতলের কারুকাজ করা বিচিত্র কড়া। দুধ-সাদা কলিংবেলের বোতাম। বোতাম টিপতেই ভেতরে একটা কুকুর মিহি গলায় ঘেঁউ ঘেঁউ করে উঠল! দরজা খুলল আয়াশ্রেণীর এক মহিলা।

অনিল ইতস্তত করে বললে, 'মঞ্জুলাদেবী আছেন?'

'হ্যাঁ আছেন, ভেতরে এসে বসুন।'

অনিল ভেতরে ঢুকতেই গাঢ় বাদামী রঙের একটা কুকুর এসে ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে ফিরে শুঁকতে লাগল। সোফায় বসেও নিস্তার নেই। লাফিয়ে পাশে উঠে বার কতক নাক মুখ চেটে দিল। লোমে পাউডারের গন্ধ। বসার ঘরটা বিশাল।

কাঠের ওপর ফুলতোলা সব সোফাসেট। নিখুঁত করে সাজানো। দেয়াল ঘেঁসে এখানে ওখানে পেতলের কাজ করা, নানা মাপের সাইড টেবিল। বড় বড় জানলায় ফিনফিনে নীল পর্দা। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা অর্গান। এক পাশের দেয়ালে একটা মুখোস ঝুলছে। তিনটে ঝাড় লণ্ঠন। কার্পেট। বেলজিয়াম কাঁচের বিশাল আয়না। সব মিলিয়ে রাজকীয়।

মঞ্জুলা ঘরে ঢুকতে অনিল ভীষণ অবাক হয়ে গেল। প্রায় মাধবীর বয়সী। তাছাড়া এমুখ কোথাও যেন দেখেছে দেখেছে।

নিশ্চয়ই কোনও পাপের আস্তানায়। পাপের পথই ঐশ্বর্যের পথ। মঞ্জুলা খসখসে গলায় বলল,

'কে আপনি ?'

অনিল চমকে উঠল। মনোযোগ দিয়ে মঞ্জুলাকেই দেখছিল। দেখার মতই জিনিস। শাড়ি এত ফিনফিনে হয়! পারসীদের অবশ্য এমন শাড়ি পরতে দেখেছে। সারা গায়ে মিষ্টি সুবাস। নির্জন দুপুর যেন সম্ভাবনায় ভরে উঠেছে। এক সময় মহিলা খুবই ফর্সা ছিলেন। এখন যেন গায়ে ধোঁয়া লেগেছে। বেশ প্যাক করা শরীর। অনিলের হঠাৎ সেই বাউল গানটা মনে পড়ে গেল ঃ চারিদিকে পাপ রে ভাই/নেই কোথাও কোনো আলো/এর চেয়ে অন্ধ হওয়া ছিল রে ভাই ভাল। অনিল বললে,

'আমি রঞ্জনের বাবা।'

'ও তাই নাকি।'

মঞ্জুলা পায়ের ওপরে পা তুলে বসল। অনিলের গত রাতের আত্মোপলব্ধি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। রক্তে আবার সেই চিৎকার। মশলার গন্ধ। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে মাংস কষার মোগলাই মেজাজ। মঞ্জুলার পায়ের অনেকটাই অনাবৃত হয়ে পড়েছে। লোমনাশক মেখে মেখে গোলাপী বর্ণ। সেই পা আবার মৃদু মৃদু দুলছে। চেতনাকে যেন টুকুস টুকুস টোকরাচ্ছে।

অনিল বললে,

'আমার ছেলের খবর আপনি কিছু জানেন ?'

মৃদু হেসে মঞ্জুলা বললে. 'হ্যাঁ ছেলেটি ভাল, বেশ কথা শোনে। তবে একটু খেয়ালি।'

'সে খবর নয়, আজ চারপাঁচ দিন সে নিরুদ্দেশ, কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি তাকে দীঘায় পাঠিয়েছেন ?'

'নাঃ, তার তো কাল আমার সঙ্গে যাবার কথা!'

'আপনার কাছে এর মধ্যে আসেনি ?'

'সাত আট দিন আগে রাতের দিকে এসেছিল। আমি একটু ইনটকসিকেটেড ছিলুম। সেই সময় কি একটা ব্যাপারে, আমি

টেম্পার চেক করতে পারিনি, ঠাস করে একটা চড় মেরেছিলুম। ইমিজিয়েটলি হি লেফ্ট। তবে সেটা কোনো কারণ নয়। আগেও আমাদের ওরকম হয়েছে। হি টেকস ইট ভেরি স্পোর্টিংলি।'

'এখানে কি জন্যে আসে?'

'আমাকে ভালবাসে বলে। আই অলসো লাইক হিম। হোয়েন আই ফিল লোনলি, আই নিউ কম্প্যানি। এতে তো দোষের কিছু নেই! উল্ফের মত মানুষও প্যাক অ্যানিম্যাল। সঙ্গ চায়।'

'তা বলে, ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে তো?'

'ভবিষ্যৎ আবার কি? পুওর ডাইজ পুওরার, রিচ ডাইজ রিচার, সিন ডাইজ উইথ দি সিনার। সো হোয়াট।'

'আমি ওর বাবা।'

'সো হোয়াট! সে তো কেউ না কেউ কারুর বাবা হবেই। ল' অফ নেচার।'

'আমার একটা দুশ্চিন্তা আছে।'

'ডাই উইথ দ্যাট।'

'আপনার হচ্ছে না?'

'না, আমি আমার সব সেন্টিমেন্ট মেরে ফেলেছি। পৃথিবীটা আমার কাছে একটা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ওয়ার্ল্ড। টুলস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টসে ভরা। আই হ্যাভ লস্ট আ স্ক্রুড্রাইভার, আই উইল গেট অ্যানাদার স্ক্রুড্রাইভার।'

'ও।' অনিল কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। এ আবার সম্পূর্ণ অন্য ধাতু। অন্য শব্দ।

মঞ্জুলা বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করে পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ কাটা গলায় বললে, 'ইউ লুক সিলি। ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম অ্যান্ড ইয়োর টাইম।'

ঘাড়ধাক্কা খেয়ে অনিল খাঁ খাঁ ডিকসন লেনে এসে দাঁড়াল। ভাদুয়া রোদে পৃথিবী জ্বলছে। শরীর জ্বললে। মেয়ে মাকড়সার গল্প শুনেছে। একটা বিশেষ সময়ের পরে পুরুষ মাকড়সাকে চুষে খেয়ে ফেলে। ভীমরুল দেখেছে। হলুদ বোলতাকে পায়ে চেপে ধরে মাথায় হুল ফোটাচ্ছে, কড়কড় শব্দে। ঘিলু চুষে

নিয়ে উড়ে যাবার পর, বোলতাটা পড়ে পড়ে অনেকক্ষণ ছটফট করতে করতে মরে যায়। অনিল বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে একবার তাকাল। মনে হল চাবুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

এবার তাহলে কি হবে? দীর্ঘ অপেক্ষা। তুই ফিরে আয়। শেষ আর একবার দেখতে হবে মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে। তারা কিছু তো একটা করবেই। অনিল একটা ট্রামে উঠে পড়ল। নিজেকে কেমন যেন অসংলগ্ন আর বিক্ষিপ্ত লাগছে। দড়ির বাঁধন খুলে মাঝ রাস্তায় জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়লে যেমন লাগে।

অনিল সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বললেন, 'এসেছেন ভাল করেছেন, এই ছবিগুলো দেখুন তো।'

অনিলের হাতে একগাদা ফটোগ্রাফ। ধুলোপড়া চায়ের দাগ লাগা টেবিল। টিনের চেয়ার। অল্প আলো। অনিল একের পর এক অনাসক্ত মৃত মুখের ছবি দেখে চলেছে। যেমন তোলার কায়দা তেমন প্রিন্ট। দায়সারা কাজ। তবু দেখলে চমকে উঠতে হয়। যন্ত্রণায় মৃত্যু নিয়ে যাবার আগে পদাঘাত করে গেছে। ঠেলে আসা ভাষাহীন নিমীলিত চোখ। ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট। গভীর সব ক্ষতচিহ্ন। এদেরই হয়ত কত বোলচাল ছিল। কত অহঙ্কার ছিল, পাপ ছিল। আর কোনোদিন জেগে উঠবে না। অলিখিত ইতিহাস সরকারী ফাইলে চাপা পড়ে রইল। এসব ছবি দেখা যায় না। মনে ভূমিকম্প হয়। বিশ্বাস, অবিশ্বাস সব ভেঙে ভেঙে পড়ে যায়। একটা মুখের সঙ্গে রঞ্জনের মুখের ভীষণ মিল; কিন্তু বয়েসটা বেশি! গলার কাছে গভীর ক্ষত। অনিল খুব ভাল করে দেখল। না রঞ্জন নয়।

ছবির প্যাকেট ফিরিয়ে দিয়ে সে আবার পথে এসে দাঁড়াল। চড়া আলোয় নিজের হাত পা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বারে বারে। মানুষের ভেতরটা যত শক্ত, বাইরেটা তত নয়। বড়ো নরম, বড়ো অপলকা। একটা ঘষা লাগলে ছড়ে যায়। এক কোপে কণ্ঠনালী দু ফাঁক হয়ে প্রাণবায়ু সরে পড়ে। অথচ ভেতরে কত দাপট, কত সব ইচ্ছা অনিচ্ছা। কত বদমায়েসি। ওই তো, শেষকালে ওই ছবির মত মরা মাছের চোখ, ঝুলে পড়া ঠোঁট। মুখ বিস্বাদ, মন

ভারাক্রান্ত। উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দাম্ভিক সেনানায়ক দেখছে, যুদ্ধে হার হয়েছে। ছত্রাকার রণক্ষেত্র।

বিষ দিয়েই বিষ মারতে হবে।

মায়া! নামটা বেশ। সবই তো মায়া। বর্ণমালায় আর কয়েকটা অক্ষর এগোলেই সায়া। অনিল মনে মনে হাসল। হয় না। কুকুরের বাঁকা ন্যাজ সোজা হয় না। দৈত্যেও পারবে না, দেবতাতেও পারবে না। রক্ত বেরোলেও উট সেই কাঁটা গাছ খাবেই। কাক যত চেষ্টাই করুক গলা দিয়ে কোকিলের সুর বেরোবে? ভেতর থেকে যাকে যেদিকে ঠেলবে তাকে সেদিকে যেতেই হবে। মঞ্জুলার কাছে রঞ্জন কেন? মঞ্জুলা তো তারই বিষয়। রঞ্জন? সে তো ছোট অনিল। ছোট হয়েও বড়। তাকে মেরে বেরিয়ে গেছে।

মায়া-বাঁধন কেটে অনিল নটা নাগাদ উঠে পড়ল। নখর দন্তহীন ব্যাঘ্র আর কত খাবে। থাকত রঞ্জনের মত একটা শরীর? ভেতরের কলকব্জার অর্ধেক অচল। ঘড়ির মত অবস্থা। ছোটো-খাটো মেকানিকে আর হবে না। খোদ কোম্পানিতে পাঠাতে হবে।

অনিল যখন রিক্সা থেকে বাড়ির সামনে নামছে, মাধবী তখন দেখেই বুঝল, আজকের অনিল কালকের অনিল নয়, চিরকালের অনিল। নাকটা লাল। চোখে সন্দেহের লাল নজর। বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ। তবে একটু কম। ভেতরটা বেরিয়ে পড়লেও সবটা বেরোয়নি। অনিল মাধবীর কাঁধে ভারী ডান হাতটা রাখল। হাতের বড় বড় লোম গলার কাছে লাগছে। সমুদ্রের ফেনার মত আলো ছড়ানো, চাপা বারান্দায় মাধবীর পাশে পাশে পা ঘষে ঘষে অনিল হেঁটে চলেছে। ডান পাশেই ঘরের দরজা। একটা পা তুলে ঢুকতে গিয়েও কি ভেবে ঢুকল না, টাল খেয়ে পিছিয়ে এল। বাতাস লাগা গোলপাতার মত দুলতে দুলতে মাধবীর চিবুকের তলায় একটা আঙুল রেখে মুখটা সামান্য ওপর দিকে তুলে ধরে জড়ানো গলায় বললে, 'ভেবো না, বুঝলে, ভেবো না। আসার হলে সে ফিরে আসবে। আর যদি না আসে তা হলে আসবে না। আমি

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছি। কাল সকালে তোমার ছেলের ছবি কাগজে বেরোবে। রঞ্জন, ফিরে আয়।'

সকালের কাগজে দুইয়ের পাতায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ওপরে রঞ্জনের ছবি। তলায় লেখা, 'অনিল, ফিরে আয়, তোর মা শয্যাশায়ী। টাকার দরকার থাকলে লিখে জানা। ফিরে এসে মাকে বাঁচা। তোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই।'

আজ আছি কাল নেই

'কে দীনবন্ধু নাকি ? এখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছো ?'

'আরে ভবেশ নাকি ? তুমি এ সময়ে ! কোথায় চললে ? বাড়ি ঢুকলে না ? আমার পাশ দিয়েই তো দুরমুশ করতে করতে গেলে, বেরিয়ে এলে কেন ? অফিস থেকে ফিরলে, চা জলখাবার খাবে। কুশল বিনিময় করবে সারাদিনের পর। এমন আধলা ইট খাওয়া লেড়ি কুকুরের মত মুখ কেন গো ?'

'তোমার পাশে একটু স্থান হবে ভাই ?'

'হবে, বারোয়ারি রক, ধুলো ঝেড়ে বোসো। বেশি ওপাশে যেও না। কেলো এইমাত্র বেপাড়ার এক মস্তান কুকুরের সঙ্গে চুলোচুলি করে এসে সবে ন্যাজ গুটিয়ে শুয়েছে। মেজাজ চড়ে আছে। ঘাঁক করলেই তলপেটে চোদ্দটা।' ফুঁ ফুঁ করে ধুলো উড়িয়ে ভবেশ বসে পড়ল। বসার সময় হাতের আঙুলে কী একটা ঠেকল। দীনবন্ধুর বাজারের ব্যাগ। কপি, মুলো, ভিজে ভিজে পালংশাক চারপাশে ছেদরে আছে। দীনবন্ধু অফিস থেকে ফেরার পথে রোজই বাজারটা সেরে আসে। অভ্যাসটা মন্দ নয়। শীতের ছোট্ট সকালে খানিক সময় বেরোয়। একটু তারিয়ে তারিয়ে দাড়ি কামানো যায়। নয়ত তাড়াহুড়োয় ধরো আর মারো টান। ছাল-চামড়া গুটিয়ে সাফ।

ভবেশ বলল, 'একী, বাজার নিয়ে বসে আছো? দু'কদম এগোলেই তো বাড়ি। বাজারটা রেখে এলেই পারতে। এই নোঙরায় ফেলে রেখেছো? পালমে ইনফেকসান ঢুকবে।'

দীনবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হাতে ঘড়ি নেই, কটা বাজল তোমার ঘড়িতে?

'আটটা বাজতে দশ।'

'উঃ এখনো ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'হ্যাঁরে ভাই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'বুঝতে তাহলে পেরেছো কেন বসে আছি?'

'হ্যাঁরে ভাই পেরেছি। একটু চা হলে মন্দ হত না।'

'এখান থেকে হেঁকে বিভূতিকে বলো, ভাঁড়ে দুটো চা। দুটো লেড়ো বিস্কুটও দিতে বলো।'

দীনবন্ধু আর ভবেশ খান ছয় বাড়ির ব্যবধানে থাকে। দুজনেই ভাল চাকরি করে। নির্বিরোধী ভদ্রলোক বলে পাড়ায় যথেষ্ট সুনাম আছে। এ তল্লাটে সস্তায় জমি পেয়ে দুজনেই বাড়ি তৈরি করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসার-ধর্ম পালন করছে। সেই কথায় আছে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির হেলে গরু কিনে। দুজনের বাড়ির ছাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে পাঁচটি করে অ্যালুমিনিয়ামের আঙুল আকাশের গায়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুঁজছে। চ্যাটালো তার বেয়ে সেই আশীর্বাদ ভেন্টিলেটার গলে কাঁচের পর্দায় কখনো নৃত্যে, কখনো কথকথায়, কখনো সঙ্গীতে গলে গলে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক দিন শনিবার। সেদিন হয় বাংলা, না হয় হিন্দী ছায়াছবি। গেরস্থের আর্তনাদ, পাঁচু প্রাণ যায়।

অদ্য সেই শনিবার। বাংলা ছায়াছবির আসর, অশ্রুসিক্ত ছবি। খটখটে ছবি হলেও দর্শকের অভাব হয় না। পালে পালে পিলপিল করে আসতে থাকেন নেণ্ডিগেণ্ডি, পুঁচিপেঁটকি নিয়ে। দীনবন্ধু টিভি কিনেছিল এরিয়ারের টাকায় স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে। আহা। একা একা বাড়িতে থাকে, সন্ধেটা তোমার ভালই কাটবে। স্ত্রীও খুব নেচেছিল। টিভি আসবে শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কচুরি ভেজে স্বামীকে খাইয়েছিল। জুট কার্পেট পাতা লবিতে টিভি

সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ছাদে ফোঁস করে ফুঁসে উঠল টিভিঙ্গুলি। সারা পাড়াকে জানান দিতে লাগল, আমি এসেছি, আমি এসেছি। তোমরা এস হে। একবার বুঝিয়ে দিয়ে যাও কত ধানে কত চাল।

ভবেশ টিভি কিনেছিল গৃহবন্দী, অবসরভোগী বৃদ্ধ পিতার সান্ধ্যসঙ্গী হিসেবে। দোতলায় পিতার সুবৃহৎ শয়নকক্ষে নীল পর্দা আঁটা সেই যন্ত্র এখনও শক্তিশালী যন্ত্রণা। ডজনখানেক বিভিন্ন স্বভাবের বৃদ্ধের পীঠস্থান। তাঁদের হাঁচি, কাশি, নাসিকাঝার্তন, কলহ, মতামত প্রকাশের ঘটনায় প্রতিটি সন্ধ্যা ভবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়, য পলায়তে স জীবতি।

দুই কৃতকর্মভোগী কৃতী পুরুষ পাঁচুবাবুর রকে বসে ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন। মশা তাড়াচ্ছেন। নর্দমার চাপা গন্ধ শুঁকছেন আর মনে মনে বলছেন, একেই বলে, বাঁশ কেন ঝাড়ে আয় মোর হিন্দুস্থানে। ভাঁড়টাকে সাবধানে পায়ের তলার বন্ধ নর্দমায় বিসর্জন দিয়ে ভবেশ বললে, ভট করে চা খেয়ে ফেললুম, বড় বাইরে পেলে মরব!

মরবে কেন? বাড়িতে গিয়ে নামিয়ে আসবে।

বাথরুম খালি পেলে তো? বারোটা শর্করারোগী মিনিটে মিনিটে ছুটছেন, আর প্রতিবার হাতে জল নিয়ে সেইখানে আর গোড়ালিতে শাস্ত্রসম্মত ঝাপটা মারছেন। চোখ বুজিয়ে বাথরুমের অবস্থাটা একবার অবলোকন করার চেষ্টা কর ভাই। কর্পোরেশনও লজ্জা পাবে।

তোমার বাথরুম? আমি মানসচক্ষে আমার বসার ঘর দেখছি আর আঁতকে আঁতকে উঠছি।

দীনবন্ধুর বসার ঘর ঠেসে গেছে। অনাহূতরা সারি সারি বসে আছেন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মত। কাউকেই ফেরাবার উপায় নেই। শত্রুতা বেড়ে যাবে। বলে বেড়াবে বেটার অহঙ্কার হয়েছে। ভগবানের গুনছুঁচ যেদিন বেলুন ফুটো করে দেবে সেদিন চামচিকির মত চুপসে গাবগাছের তলায় পড়ে থাকবে। দীনবন্ধুর স্ত্রী শাপশাপান্তকে ভীষণ ভয় পায়। লাল আলোয়ান গায়ে ওই যে বসে আছেন মিনুর দিদিমা। দু-হাঁটুতেই বাত। অন্য

সবাই মেঝেতে কার্পেটের ওপর থেবড়ে আছেন, তিনি বসেছেন সোফায়। মুখপোড়া বাত আর জায়গা পেলে না, ধরল এসে হাঁটুতে। 'কত্তা যাবার সময় ওইটি দিয়ে গেলেন।' গোবিন্দের মা কোণের দিক থেকে বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন, কত্তা একটা বাড়ি রেখে গেছেন, তিনটি ছেলে দিয়ে গেছেন, চার মেয়ে। আর কী চাই?'

'আ মোল কথার ছিরি দেখ। আমরা আজকালের বিবি ছিলুম না তোদের মত। সারা জীবন পেটে একটা কিছু না থাকলে আমাদের কালো শরীরটা খালি খালি মনে হত। কত্তা গর্ব করে বলতেন, সুখদা আমার ইঁদুরকল, একটু ঠুকরেছ কি অমনি ঝপাং। হাত ঠেকালেই সোনা। তোমরা হলে ফাঁকিবাজ। একটা কি দুটো, অমনি ছুটলে। কাটিয়ে কুটিয়ে ফাঁকা হয়ে ফিরে এলে।'

দীনবন্ধুর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী হচ্ছে দিদিমা? বাচ্চারা বসে আছে।'

'তুমি আর সাউকুড়ি করতে এসো না। ওরা সব বাচ্চার বাবা। দেখলে না ঠুলির বিজ্ঞাপনের সময় কী রকম হাসাহাসি করছিল। তুমি মা এযুগের মেয়ে। তুমি ওসব বুঝবে না। তোমরা হলে মেয়েমানুষ। আমাদের কালে মুতের কাঁতা শুকোতে পেত না। দাও এক গোলাস জল দাও। আ মর, সিনেমা বন্ধ করে মাগী সেই থেকে বকেই মরছে। আহা কী রূপের ছিরি। চুলে বব করে বসে আছেন। বুকের দিকে না তাকালে ছেলে কি মেয়ে বোঝে কার বাপের সাধ্য।'

বুলডগের মত মুখ করে মিনুর দিদিমা পাগলে পাগলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একেবারে লাগোয়া বাড়ির চার বউ রেলের পিস্টনের মত আসা যাওয়া করছেন! স্থির হয়ে বসার উপায় আছে কি? পাশে ছড়ানো সংসার। টিয়াপাখির ঠুকরে ঠুকরে পেয়ারা খাবার কায়দায় চার বউয়ের টিভি দেখা চলেছে। ব্যোমে পায়রা বসার মত। বড় বউ যেন দিশি গোলাপায়রা। বয়সের মাঝ সমুদ্রে বয়ার মত শরীর। তিনি একটি বেতের মোড়া দখল করেছেন।

তাঁর সন্তানসন্ততিতে চারপাশে গোল করে মাকে ঘিরে

রেখেছে। বসতে না বসতেই তাঁর খেয়াল হল, আলমারির গায়ে চাবিটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছেন। সৃষ্টি পড়ে আছে আলমারিতে। দিনকাল ভাল নয়। বড মেয়েকে বললেন, 'চাবিটা নিয়ে আয় তো।' বড় মেয়ে ছবিতে মশগুল। প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালতে গান ধরেছে, এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত? লাল্লা লালা লালা। বড় বললে, 'থাক না'। মা একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়লে, 'টিভি দেখা ঘুচিয়ে দেব তোমার।' মেয়ে অন্যমনস্কে উত্তর দিল, 'যাও যাও, সব করবে।' মা হুহুঙ্কারে বললেন, 'দেখবি ?'

মিনুর দিদিমা বললেন, 'দুটোকেই বের করে দাও।'

বড় বউ মুখ বেঁকিয়ে ভেঙচি কেটে বললেন, 'কত বড়ো সাহস। যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। আপনি বের করে দেবার কে ?'

মিনুর দিদিমা হুঙ্কার ছাড়লেন দীনবন্ধুর স্ত্রীকে, 'বউমা, বউমা।'

বড় বউ ততোধিক জোরে বললেন, 'বউমা কী করবে ? বউমা এসে আমার মাথা কেটে নেবে ?'

টিভির পর্দায় নায়ক নায়িকারা তখন কোরাসে চেল্লাচ্ছে, লা লালা, লাল্লা, লাল্লা।

মেজ বউটি যেন সিরাজু পায়রা। লাট খেতে খেতে এলেন, এসেই বললেন, 'যাও, দেখগে যাও তোমার নতুন সুজনিতে ছোটর ছেলে পেচ্ছাব করেছে।'

'তোশক ভিজেছে, তোশক ভিজেছে ?' বড় বউ মোড়া ফেলে লাফিয়ে উঠল। ধাক্কায় মোড়া কাত হয়ে মহাদেবের ডম্বরুর মত গড়াতে গড়াতে গদাইয়ের মার কোলের ছেলেটার মাথায় গিয়ে খোঁচা মারল। আঁচলচাপা ছেলে চুকুর চুকুর দুধ খাচ্ছিল। অষ্টপ্রহর তিনি চুষতে না পেলে চিল্লে বাড়ি মাথায় করেন, মোড়ার খোঁচায় বোঁটা ছেড়ে তিনি 'হাইফাই' স্পিকারের মত ওঁয়া ওঁয়া, হোঁয়া······ ওঁয়াও করে মিউজিক ছাড়লেন। প্রেমিক প্রেমিকার 'তুমি, তুমি' হুইসপার চাপা পড়ে গেল। মেজ পুতুল নাচের ধসে পড়া

পুতুলের মত জমির হাতখানেক ওপর দিয়ে লাট খেয়ে একপায়ে ঝপাত করে বসে পড়ে বললেন, 'কার মিউজিক? কার মিউজিক রে?'

পম্পা, শম্পা, চম্পা তিন বোন। বাপ মা দু'জনেই চাকুরে। মাথায় মাথায় তিন বোন। পম্পা শরীরের চেয়েও ঘেরে বড় ম্যাকসি পরে, একবার করে আসছে, বসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। আসা আর যাওয়ার পথে পোশাকের ধাক্কায় সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে উল্টে গেল দাঁড়ান টেবিলল্যাম্প। শেডফেড ছিটকে চলে গেল। মিনুর দিদিমা বললেন, 'দিনুর কাণ্ড দেখ। মাথার ওপর এত আলো, তাতে হচ্ছে না। ব্যাঙের ছাতার মতো আলো গজিয়েছে মেঝে থেকে।'

দ্বিতীয়বার ছিটকে পড়ল কাটগ্লাসের অ্যাশট্রে। সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাই কাঠি কার্পেটের ওপর ছত্রাকার। তার ওপর থেবড়ে বসলেন পাশের বাড়ির সেজবউ। বসতে বসতে বললেন, 'বেশিক্ষণ বসবো না। ডাল চাপিয়ে এসেছি।' যেন সমবেত মহিলামণ্ডলী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি কতক্ষণ বসবেন। কেন বসবেন না।

হঠাৎ সামনের সারির এক বাচ্চা আর একটা বাচ্চার ঝুঁটি ধরে বেশ বারকতক ঝাঁকিয়ে দিল। লেগে গেল দুজনে ঝটাপটি। তার-ফার ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হবার আগেই দিনুর বউ দৌড়ে গিয়ে দু' পাশে সরিয়ে দিল। এ বলে তুই বাপ তুললি কেন, ও বলে তুই বাপ তুললি কেন? দিনুর বাড়ি যে মহিলা কাজ করেন, এরা তার বংশপরম্পরা। কান ধরে বার করে দিলে কাল থেকে তিনি আর কাজে আসবেন না। দুজনকে দুকোণে বসাতে হল। সেখান থেকেই তারা মুখে ভ্যাঙাভেঙি করতে লাগল। একজনের বই ভাল লাগেনি, সে হাত পা ছাড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। ঠ্যাং ধরে টেনে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। এখুনি বাড়ি ঘেরাও হয়ে যাবে। দীনের বন্ধুরা এসে দিনুর মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেবে।

বড় বউ লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে মেয়েদের হুকুম করলেন, 'যা ছোটর বিছানায় করে আয়। ভাসিয়ে দিয়ে আয়।' মেজ

হাতের তালুতে চিবুক রেখে দাঁত চাপা সুরে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ করে আয়, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।'

যে মেয়ে চাবি আনতে রাজি হচ্ছিল না, ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে সে তীর বেগে ছুটল। ছোট মেয়ে বোকা, সে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'দিদি কী করতে গেল মা?' ওপাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'হিসি।'

দিনুর স্ত্রী থাকতে না পেরে রাগ রাগ গলায় বললে, 'টিভি বন্ধ করে দি।'

মিনুর দিদিমা বললেন, 'বাড়িতে বায়োস্কোপ বসালে অমন একটু হবেই মা! অধৈর্য হলে চলে?'

নায়ক নায়িকাকে একটু আদর টাদর করছিলেন। কোণের দিকে বখা বাচ্চাটা সিক করে সিটি মেরে উঠল। ওরই মধ্যে প্রবীণা একজন আপত্তি করলেন, 'এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ভদ্দর লোক ছোটলোক এক হয়ে গেলে না হয়।'

ব্যাস, লেগে গেল ধুন্ধুমার! 'ছোটলোক। কথার ছিরি দ্যাখো। নিজে ভারী ভদ্দরলোক। ছেলে তো ছমাস বাইরে ছমাস ভেতরে।'

মিনুর দিদিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁগা, এই বুঝি তোমাদের উত্তমকুমার?'

পম্পা পাল তুলে ফড় ফড় করে চলে গেল। বাতাসে দেয়াল থেকে ক্যালেন্ডার খসে পড়ল। পম্পা হ্যাট্রিক না করে ছাড়বে না জানা কথা। দৃকপাত নেই। সেই একগাল হেসে বললে, 'কী সুন্দর!'

বড়র মেয়ে ফিরে এসে বললে, 'ওদের চাদরে হলুদের হাত মুছে দিয়ে এসেছি। গোদা পায়ের ছাপ মেরে এসেছি।'

সেজবউ বললে, 'কাজটা ভাল করনি।'

মেজ বললে, 'কেন করেনি? বেশ করেছে। ওদের সঙ্গে ওই-রকমই করা উচিত। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। শাস্ত্রে আছে।'

সেজ বললে, 'বাচ্চা ছেলে শীতের সময় একটু করে ফেলেছে। তোমরা দুজনে আদাজল খেয়ে মেয়েটার পেছনে লেগেছ।'

'তোমাকে যে উল দিয়ে হাত করেছে। তুমি তো বলবেই।'

দীনবন্ধু ভবেশকে বললে, 'আর তো পারা যায় না। সময় যে চলতে চায় না! বাজল কটা?'

'প্রায় মেরে এনেছি।'

কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল। দীনু বললে, 'ব্যাটাও পেছনে লেগেছে। সেই থেকে খ্যাচর খ্যাচর গা চুলকাচ্ছে আর ভটাস ভটাস গা ঝাড়া দিচ্ছে।'

ভবেশ ঘড়ি দেখে বললে, 'এবার ওঠা যেতে পারে। শেষ হয়েছে সিনেমা।'

বাড়ি ঢুকে দীনবন্ধু প্রথমে গেট বন্ধ করল। দুটো পাল্লাই হাট খোলা ছিল। সদরে ঢোকার মুখে ধেড়ে পাপোস পায়ের ধাক্কায় মাতালের মত কাত হয়ে পড়েছিল। দিনু ধুলো-সমেত টেনেটুনে সেটাকে যথাস্থানে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পটাকে সোজা দাঁড় করাতে করাতে বললে, 'এটা কী হয়েছে? হকি খেলছিলে নাকি।'

দিনুর স্ত্রী বললে, 'ওই রকমই হবে।'

'এ কী! দামী অ্যাশট্রে, এখানে উল্টে পড়ে আছে! তোমরা সত্যি! মিনুর দিদিমা সিগারেট খাচ্ছিল?'

দিনুর স্ত্রী বললে, 'এটা কথা নয়। ওইরকমই হবে।'

'এ কী! এখানে কে চীনাবাদামের খোসা জড়ো করেছে? তুমি সত্যি একেবারে কাছাকোঁচা খোলা!

'ওইরকমই হবে।'

'তার মানে? সামনের শনিবার স্ট্রেট বলে দেবে, হবে না, ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমি পারবো না, পারলে তুমি বোলো।'

দিনু চাপা গলায় বললে, 'আপদ।'

'তোমারই আমদানি।'

'দীনু কার্পেটের ওপর ঝাড়ু চালাতে চালাতে বললে, 'ধূপ জ্বালো, ধূপ। সারা ঘর ভেপসে উঠেছে।'

টিভির সামনে এসে মনে মনে সেই প্রার্থনা আবার জানাল, 'হে পিকচার টিউব, দয়া করে বিকল হও।'

ওদিকে ভবেশ বৃদ্ধ সিধু জ্যাঠাকে বাড়ি পেঁছে দিতে দিতে একই প্রার্থনা বিধাতার দরবারে পেশ করল। বৃদ্ধ কাশতে কাশতে বললেন, 'চোখে ছানি, দেখতে পাই না, তবু সময়টা বেশ কাটে। একটা হিসেবও পাওয়া যায়, কে রইল কে গেল। আজ আছি কাল নেই।'